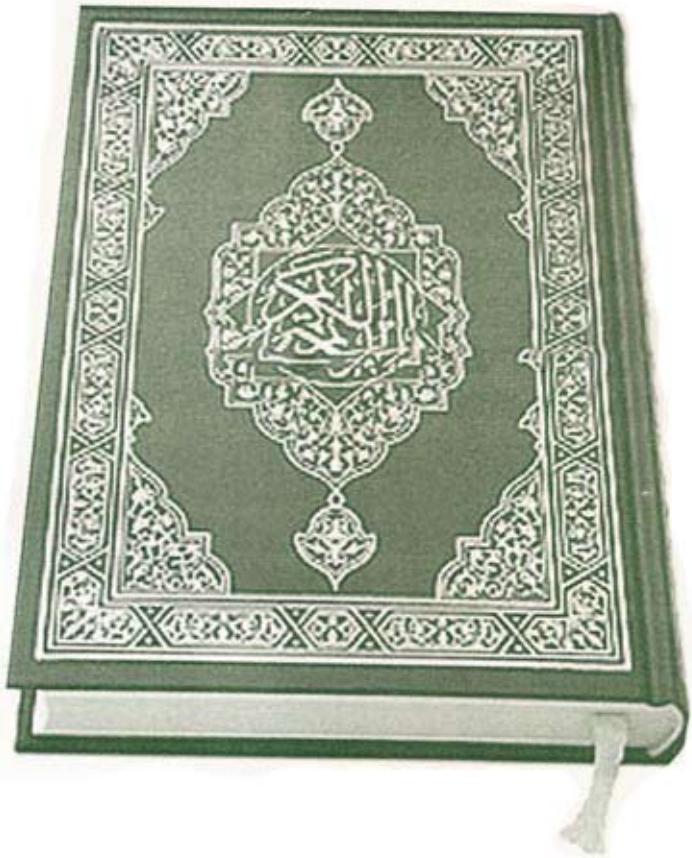

অঙ্কের ভাষ্যে আল্ কুরআান

হারূন ইয়াহিয়া

পাঠক!

আমাদের ওয়েব সাইট www.islambanglabd.com ভিজিট করুন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখকদের নিম্নলিখিত প্রবন্ধ, পুস্তিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি বাংলায় পড়ুনঃ

- নবী (ছ্-)র নামায ও জামায়াতে নামায- শাইখ আব্দুল য়াজীজ ইব্ন বাজ: ।
- ঈমানের দুর্বলতা নিরাময়- শেইখ মুহ:াম্মাদ সালিহ্ আল-মুনাজ্জিদ্ব ।
- যাকাত- ইসলামী অর্থনীতি- গুলাম আহমেদ পারভেজ ।
- আপনার জিজ্ঞাসা আর কুরআানের জবাব- মুহ:াম্মাদ ইয়াহিয়া আল্ তুম ।
- নবী (ছ্-)র জন্ম দিন উদ্যাপন- সালিহ্ আল্ ফৌজান ।
- অজ্ঞের ভাষ্যে আল্ কুরআান- হারুন ইয়াহিয়া ।

প্রকাশের পথে-

- আল্লাহ্র কত নাম!- হারুন ইয়াহিয়া ।
- মুহ:াম্মাদ (ছ্-) সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী মানব - মাইকেল হার্ট ।
- জীবনের গল্প- আকরমুল্লাহ্ সাইয়িদ্ব ।

উল্লেখ্য, আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ, পুস্তক ইত্যাদি প্রচার-প্রচারণা এবং শিক্ষা ও গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত । প্রকাশনার মানোন্নয়নের জন্য সাক্ষাতে, পত্রে, ফোনে বা ই-মেইলে প্রেরিত যে কোন পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হয়, যত্নের সাথে বিবেচনা করা হয় ও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয় ।

ফয়েজুর রহমান
ফোন ০১৭১১৫৯২৮৮৮
email: faizur1977@gmail.com

অজ্ঞের ভাষ্যে আল্ কুরআান

হারূন ইয়াহিয়া

অনুবাদ
কবীর মোহাম্মদ হুমায়ূন

আমরা বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিয়েছি কুরআনে,
যাতে তারা লক্ষ্য করে,
অথচ তা তাদের দূরেই সরায়! (সূর- ইস্‌র-য়িল-৪১)।

অজ্ঞের ভাষ্যে আল্ কুরআন
মূল - হারুন ইয়াহিয়া
অনুবাদ - কবীর মোহাম্মদ হুমায়ূন

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৪

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১১
চৈত্র ১৪১৭
রবিউস্ সানি ১৪৩১।

প্রকাশক : ফয়েজুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা, জাকেরা গার্ডেন মসজিদ
৩৮/৬ শান্তি নগর, ঢাকা- ১২১৭

ফোন : ০১৭১১৫৯২৮৮৮।
মুদ্রণ ও বাঁধাই: কলম প্রিন্টিং প্রেস
ফোন : ৮৩১৭৬১৭

মূল্য : ৳ ১০০.০০।

ইন্টারনেটে প্রাপ্তি ঃ www.islambanglabd.com

HOW DO THE UNWISE INTERPRET THE QURAN? : Written in English by HARUN YAHYA. Translated into Bangla
by Kabir Mohammad Humayun. Published by Faizur Rahman, Founder, Zakera Garden Mosque, 38/6 Shanti Nagar, Dhaka- 1217. Phone: 01711592888. Email:faizur1977@gmail.com Price: $ 2.00.

এ গ্রন্থ উপলব্ধিতে অক্ষম অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক কুরআনের অপব্যাখ্যা, কুরআনের আয়াত সম্পর্কে অপব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বেশকিছু অযৌক্তিক মন্তব্য ও দাবীর উদাহরণ প্রদর্শন করে এবং এসবের কারণ বিষয়ে আলোচনা ও প্রতিউত্তর করে। অধিকন্তু, জনগণের নিকট বিখ্যাত বিজ্ঞানী বা সম্মানিত বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিগণিত কিছু লোক কর্তৃক কুরআন সম্পর্কে উত্থাপিত দাবীর মধ্যে পরিস্ফুটিত নিজস্ব বিবেকহীনতা,পূর্ব সংস্কার ও যুক্তির অপর্যাপ্ততা সম্পর্কেও দৃকপাত করে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে একজন অজ্ঞলোক তার সীমিত সামর্থ দিয়ে অসংখ্য বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, কুরআন একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে যা কেবলমাত্র যুক্তি ও অকপটতা দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং অজ্ঞ লোকের তৈরীকৃত ব্যাখ্যায় ও আপত্তিতে অসংগতি দেখে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কারণ নেই।

কুরআন বলে যে অবিশ্বাসীদের কোন যুক্তি বা বুদ্ধি নেই। আমরা যদি অবিশ্বাসীদের অজ্ঞ ব্যাখ্যা গুলো কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অবলোকন করি, তাহলে আমরা এ কথায় বিস্মিত হবোনা বরং এগুলোকে সতর্কীকরণ ও নিদর্শন হিসাবে গণ্য করবো।

অধিকন্তু জ্ঞাতব্য যে প্রতিটি মনগড়া যুক্তির প্রতিউত্তর করার মতো সময় বা প্রয়োজন কোনটাই প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকট নেই।

যাঁটি বিশ্বাসীর দায়িত্ব হলো কুরআনের ঘটনা ও অলৌকিকত্ব অন্যের নিকট পৌছানো। সত্য এলে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কুরআন এ আয়াতে তাই বলে: **কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, দুর্ভোগ তোমাদের ! তোমরা যা বলছো তার জন্যে (সূর- আম্বিয়াঃ ১৮)**

মিথ্যা সর্বদা বিলুপ্ত হবেই

আর বলঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। (সূর- ইস্‌র-য়িল ৮১) আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্যে আরোগ্য ও দয়া, কিন্তু তা সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূর- ইস্‌র-য়িল ৮২)

পাঠকের প্রতি নিবেদন

এ পুস্তকের সাথে পতিত বিবর্তনবাদ যুক্ত করার কারণ কি? এ প্রশ্নটি কারো মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়; জবাবে বলি অনাধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হিসাবে এ সারবত্তাহীন তত্ত্বটি অর্থাৎ ডারউইনবাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু, ডারউইনবাদ সৃষ্টি সত্য অস্বীকার করে আর সে সাথে স্রষ্টাকেও অস্বীকার করে; সেহেতু প্রায় ১৫০ বছর ধরে এ ডারউইনবাদ আনেক মানুষকে তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করছে আর অনেককে সন্দেহের মধ্যে ফেলে আসছে। সুতরাং, তত্ত্বটি যে সত্য নয় - ধর্মের শর্ত অনুযায়ী তা তুলে ধরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা মূল্যবান সেবাটি সবার নিকট লভ্য করা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংক্ষিপ্ত আকারের এ অধ্যায়টি আলোচ্য গ্রন্থসংযুক্ত করা হল।

এ বই খানা একাকী পড়া যেতে পারে বা কোন আলোচনার মাধ্যমে অনেকের নিকট তুলে ধরা যেতে পারে। যারা এ পুস্তক থেকে লাভবান হতে চান তারা পুস্তকটি আলোচনার মাধ্যমে অনেক বেশী লাভাবন হবেন; কেননা, আলোচনায় অনেকের অংশগ্রহণ জ্ঞানকে আরো সম্মৃদ্ধ করবে।

আর কেউ যদি গ্রন্থখানা ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহলে তা ধর্মের প্রতি অনন্য সেবা রূপে পরিগণিত হবে এবং আল্লাহ্‌র খুশীর কারণ হবে।

উল্লেখ্য, এ বইয়ে লেখকের কোন ব্যক্তিগত অভিমত নেই; বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সমর্থিত বিষয় গ্রন্থাকারে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

লেখক সম্পর্কে

হারুন ইয়াহিয়া ছদ্ম নামের এ লেখক ১৯৫৮ সনে আঙ্কারায় জন্ম লাভ করেন। তিনি আঙ্কারায় প্রথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে ইস্তাম্বুল মিনার সিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯৮০ র থেকে রাজনীতি, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক প্রণয়ন করে যাচ্ছেন।

তাঁর সকল লেখার একটিমাত্র উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের বার্তা সবার নিকট পৌছানো এবং এদ্বারা তিনি মানুষকে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয় যেমন - স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং স্রষ্টাহীন জীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠত পদ্ধতি (সিস্টেম) সৃষ্ট কাজ কর্মের অসারতা তুলে ধরেন।

তাঁর বই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন, ভারত থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড থেকে বসনিয়া, স্পেন থেকে ব্রাজিলের অসংখ্যক পাঠক কর্তৃক পঠিত হয়। তাঁর অনেক বই ইংরেজী, ফরাসি, জার্মান, ইতালি, পর্তুগিজ, উর্দু, আরবী, আলবেনীয়, রুশ, বসনিয়, তুর্কি, ইন্দোনেশিয় ভাষায় অনুদিত হয়ে পৃথিবীর বহু সংখ্যক পাঠকের নিকট উপভোগ্য হচেছ।

তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে – The New Masonic Order, Judaism and Freemasonry, The Disasters Darwinism Brought to Humanity, Communism in Ambush, The Bloody Ideology of Darwinism: Fascism, The 'Secret Hand' in Bosnia, Behind the Scenes of Holocaust, Behind the Scenes of Terrorism, Israel's Kurdish Card, Solution: The Morals of the Qur'an, Articles1-2-3, A weapon of Satan: Romanticism, Truths 1-2, The Western World Turns to God, The Evolution Deceit, Precise Answer To Evolutionists, Evolutionary Falsehoods, Perished Nations, For Men of Understanding, The Prophet Moses, The Prophet Joseph, The Golden Age, Allah's Artistry in Colour, Glory is Everywhere, The Truth of the Life of This World, Knowing the Truth, Eternity Has Already Begun, Timelessness and the Reality of Fate, The Dark Magic of Darwinism, The Religion of Darwinism, The Collapse of the Theory of Evolution in 20 Questions, Allah is Known Through Reason, The Qur'an Leads the Way to Science, The Real Origin of Life, Consciousness in the Cell, A String of Miracles, The Creation of the Universe, Miracles of the Qur'an, The Design in Nature, Self-Sacrifice and Intelligent Behaviour Models in Animals, The End o Darwinism, Deep Thinking: Never Plead Ignorance, The Green Miracle

Photosynthesis, The Miracle in the Cell, The Miracle in the Eye, The Miracle in the Spider, The Miracle in the Gnat, The Miracle in the Ant, The Miracle of the Immune System, The Miracle of the Creation in Plants, The Miracle in the Atom, The Miracle in the Honeybee, The Miracle of Speed, The Miracle of Hormone, The Miracle of the Termite, The Miracle of Human Being, The Miracle of Man's Creation, The Miracle of Protein, The Secrets of DNA.

তাঁর শিশুদের জন্য লেখা রয়েছে: যেমন - Children Darwin Was Lying!, The World of Animals, The Splendour in the Skies, The World of Our Little Friends: The Ants, Honeybees That Build Perfect Combs, Skillful Dam Builders: Beavers.

কুরআন সম্পর্কিত লেখার মধ্যে রয়েছে - The Basic Concepts in the Qur'an, The Moral Values of the Qur'an, Quick Grasp of Faith 1-2-3, Ever Thought About the Truth?, Crude Understanding of Disbelief, Devoted to Allah, Abandoning the Society of Ignorance, The Real Home of Believers: Paradise, Knowledge of Qur'an, Qur'an Index, Emigrating for the Cause of Allah, The Character of the Hypocrite in the Qur'an, The Secrets of Hypocrite, The Names of Allah, Communicating the Message and Disputing the Qur'an, Answers from the Quran, Death Resurrection Hell, The Struggle of the Messengers, The Avowed Enemy of Man: Satan, The Greatest Slander: Idolatry, The Religion of the Ignorant, The Arrogance of Satan, Prayer in the Qur'an, The importance of Conscience in the Qur'an, The Day of Resurrection, Never Forget, Disregarded Judgements of the Qur'an, Human Characters in the Society of Ignorance, The Importance of Patience in the Qur'an, General Information from the Qur'an, The Mature Faith, Before You Regret, Our Messengers Say, The Mercy of Believers, The Fear of Allah, The Nightmare of Disbelief, Jesus Will Return, Beauties Presented by the Qur'an for Life, A Banquet of the Beauties of Allah 1-2-3, The Iniquity Called 'Mockery', The Mystery of the Test, The True Wisdom According to the Qur'an, The Struggle with the Religion of Irreligion, The School of Yusuf, The Alliance of the Good, Slanders Spread Against Muslims Throughout History, The Importance of Following the Good word, Why Do You Deceive Yourself? Islam: The Religion of Ease Enthusiasm and Excitement in the Qur'an, Seeing Good in Everything, How Do the Unwise interpret the Qur'an?, Some Secrets of the Qur'an, The Courage of Believers, Being Hopeful in the Qur'an, Justice and Tolerance in the Quran, Basic Tenets of Islam, Those Who do not Listen to the Qur'an.

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ৮
আল্ কুরআনকে ভুল ব্যাখ্যা করার কারণ..... ১১
কুরআনের ভুল ব্যাখ্যার উদাহরণ..... ২৯
উপসংহার..... ৬২
বিবর্তনবাদী প্রবঞ্চনা..... ৬৪

ভূমিকা

আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের প্রভু ,অশেষ জ্ঞানও ক্ষমতার মালিক ; তিনি প্রেরণ করেছেন আল কুরআান যা সমগ্র মানব জাতির জন্য ক্ষমার উৎস। কুরআান প্রেরণ করে তিনি মানুষের প্রতি তার দয়াশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন। যারা আল্লাহ্র এ উপহারের প্রতি অকপটতা ও কৃতজ্ঞতার সাথে সাড়া দেবে তারা সুফল পাবে। তারা কুরআানকে বুঝবে, মানবে, কুরআানে আস্থা রাখবে আর এ ভাবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অর্জন করবে। তারা এ জগতে ও পরজগতে পুরস্কৃত হবে। অন্যদিকে, যারা কপটতা ও বিদ্বেষ নিয়ে কুরআানের প্রতি অগ্রসর হবে তারা তাদের কৃতকর্মের কুফল ভোগ করবে। তারা কখনো কুরআান উপলব্ধি করবেনা বা কুরআানের জ্ঞান থেকে উপকার পাবেনা; কার্যত তারা এ জগৎ ও পর জগতের লোকসান ভোগ করবে। তারা যা খুশী করুক, ইসলামের ক্ষতি করতে পারবেনা।

সবাই যাতে সহজে বুঝতে পারে কুরআান তেমনি ভাবে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর আয়াতে বা পংতিতে বলেন, **"হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে এসেছে হুঁশিয়ারী যা বিশ্বাসীদের মনের নিরাময়, পথনির্দেশ আর করুনা।"(সূর- ইউনুস ৫৭)**। এ পংতির চিত্রায়ণ মতে যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে এবং নিজ বিবেককে মান্য করে তারা কুরআান থেকে লাভবান হতে পারে; সহজে বুঝতে পারে আর এর নির্দেশ অনুসরণ করতে পারে।

অন্যদিকে, যারা নিজেদের সংকীর্ণতার প্রতি মনোযোগী তারা আল্লাহ্র ক্ষমতাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনা। তারা পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। তারা কুরআানের ভুল ব্যাখ্যা করার জন্য বিকৃত যুক্তি প্রয়োগ করে। কুরআানে প্রচারিত পথের অনুসন্ধান যারা করেনা তাদের স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ্ নিম্নের আয়াতে অবহিত করেন:

আমরা বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিয়েছি কুরআানে, যাতে তারা লক্ষ্য করে, অথচ তা তাদের দূরেই সরায়। (সূর- ইস্‌রয়িল-৪১)।

আমরা যখন স্পষ্ট করে দিয়েছি বলি - তা তাদের জন্য প্রজোয্য যারা বিশ্বাসে অকপট; কেননা, তারা কুরআান সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও নিজ বিবেক প্রয়োগ করে তারা সহজে বুঝতে পারে; যারা পথনির্দেশ কামনা করে তাদের জন্য আল্লাহ্ সুস্পষ্ট কিতাব আল্ কুরআান প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বাস যেরূপ বৃদ্ধি পায়; সেরূপ বিচক্ষণতা, সততা, আল্লাহ্ভীতি বৃদ্ধি পায়। ফলে, কুরআানের সূক্ষ্ম দিকও গুঢ় বিষয় অধিতর সহজে অনুধাবন করা যায়।

বিশ্বাসী নয় এমন ব্যাক্তিও যদি দূরবর্তী মতলব ছাড়া আন্তরিক ভাবে কুরআান অধ্যয়ন করে তবে সে তাৎক্ষনিক ভাবে বুঝতে পারবে যে এ বইখানা পবিত্র বই এবং সে বিশ্বাসীতে পরিণত হবে। বিশ্বাসীতে পরিণত হওয়ার পর নিজ বিশ্বাসের গভীরতা, প্রার্থনা এবং জ্ঞানের স্তর তাকে কুরআানের জটিল ও রহস্যের জগতে প্রবেশাধিকার দেবে।

বিপরীতক্রমে, যাদের আল্লাহ্য় বিশ্বাস বা ভয় নেই তারা নির্ভুলভাবে কুরআান বুঝতে পারবেনা। বস্তুত তারা জানে বলে দাবী করে এমন সহজতম বিষয়েরও ভুল ব্যাখ্যা করে। স্পষ্ট কথাও তাদের নিকট পরস্পর বিরোধী রূপে হাজির হয়। তারা যত বিচক্ষণ, জ্ঞাণবান, সংস্কৃতিবান হোকনা কেন কুরআান বিষয়ে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; আল্লাহ্য় বিশ্বাসের অভাবে তারা এর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

কুরআান বিরোধীদের দাবীগুলো খুঁটিয়ে দেখলে তাদের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তি ও যুক্তির অসংগতি গুলো সুস্পষ্ট হবে। আত্মস্বার্থবাদীগণ সুস্পষ্ট পংতিকে পরস্পর বিরোধী ও গোলমেলে দেখে। তারা এর বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপিত উদাহরণ টেনে যেসব বিভ্রান্তি ছড়ায় সে সম্পর্কে কুরআান উল্লেখ করেছে - তারা প্রশ্ন করে,**"ঈশ্বর এসমস্ত উদাহরণ দিয়ে কি বুঝাতে চান?"** প্রত্যেক যুগে অস্বীকারকারীগণ কি কারণে উদাহরণ বুঝতে পারেনি তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশ বা স্বীকার করেছে মর্মে কুরাআান আমাদের জানায়। কুরআানের একটি অলৌকিক দিক হলো এর একটি

পংতি বিশ্বাসীদের নিকট যেমন খুব সহজবোধ্য, ঠিক তেমনি ভাবে অবিশ্বসীদের নিকট তত হতবুদ্ধিকর। এ বৈশিষ্ট্য আমাদের জানিয়ে দেয় যে কুরআান বুঝা অভিপ্রায়ের সততার উপর নির্ভর করে; আর আল্লাহ্ নির্ধারণ করেন কে এর বুঝ অর্জন করবে আর কে করবেনা। কথাটি নিম্নে স্পষ্ট:

কে তার চেয়ে অধিক ভুল করবে যাকে তার প্রভুর নিদর্শন সম্পর্কে স্মরণ করানোর পর যা করেছিল তা ভুলে তা থেকে ফিরে গেছে? আমরা তাদের হৃদয়ের উপর আচ্ছাদন দিয়েছি আর কানের উপর ভার দিয়েছি যা তাদের কুরআান বুঝা থেকে নিবৃত্ত করে। তুমি যদি তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডাকো তারা কখনো পথপ্রদর্শিত হবেনা। (সূর- কু-ফ ৫৭)।

একজন সৎ ও বিবেক শাসিত বিশ্বাসী মৌলিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কুরআানের নির্দেশ সহজে বুঝতে পারে ও প্রয়োগ করতে পারে। অন্যদিকে একজন অবিশ্বাসী কপট ও পক্ষপাতি হওয়ায় এবং অত্যাধিক টেকনিক্যাল জ্ঞানের কারণে এক্সপার্ট গণ্য হওয়া সহ আরবীতে দখল থাকা সত্ত্বেও কুরআানকে সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়। কারণ, সে অনুসরণ করে তার স্বীয় ভিত্তিকে; আর তাই তার যুক্তি প্রয়োগের সামর্থ থাকেনা। যুক্তি প্রয়োগের অসামর্থের কারণে বিকৃত ও যুক্তিহীণ অনুমান দিয়ে কুরআানের আয়াতের বা পংতির ব্যাখ্যা করে।

এ পুস্তক আলোচনা করবে কি কারণে এ সব উপলব্ধিহীনরা কুরআানকে অপব্যাখ্যা করে; কুরআান সম্পর্কে তাদের অযৌক্তিক মন্তব্য ও আপত্তিকর অনেক উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করবে। অধিকন্তু, খ্যাতিমান বিজ্ঞানী বা সম্মনিত বুদ্ধিজীবী হিসেবে জনগণ কর্তৃক সমাদৃত কিছু মানুষের কুরআান সম্পর্কিত আপত্তির মধ্যেই তাদের পক্ষপাতিত্ব, যুক্তির অসারতা ও মানহীনতার বিষয় পরিস্ফুট হবে।

আল্ কুরআানকে ভুল ব্যাখ্যা করার কারণ

পক্ষপাত, দূরবর্তী মতলব ও অনান্তরিকতা

দূরবর্তী মতলব ও পক্ষপাতি মন নিয়ে যদি কেউ কুরআানের প্রতি অগ্রসর হয় তবে তার পক্ষে কুরআান বুঝা সম্ভব নয়। কুরআান আল্লাহ্‌র আইন। কেউ যদি কপট ও লুক্কায়িত উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআানকে দেখে, সে যত বড় বিচক্ষণ ও সংস্কৃতিবান হোকনা কেন, সে কুরআান সঠিক ভাবে বুঝতে পারবেনা কিম্বা ব্যাখ্যা করতে পারবেনা। ফলে বহু ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। তাই কুরআান জানায়, পক্ষপাতি ও ধূর্ত বিশ্লেষক এবং কুরআানের মাঝখানে একটি 'অস্পষ্ট পর্দা' তৈরী হবে। কুরআান যেমন বলে:

যখন তুমি কুরআান আবৃত্তি করো, তখন আমরা তোমার ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে একখানা 'অস্পষ্ট পর্দা' টেনে দেই। (সূর- ইস্‌র-য়িল ৪৫)। আমরা তাদের হৃদয়ের উপর আচ্ছাদন আর কানের উপর ভারত্ব দেই - যা কুরআান বুঝতে তাদের বাধাগ্রস্ত করে। যখন তুমি তোমার একক প্রভুর কথা কুরআানে পড়, তখন তারা পিঠ দেখিয়ে সরে যায়। (সূর- ইস্‌র-য়িল ৪৬)।

কুরআান হলো গোটা মানব জাতিকে সঠিক পথে আহ্বান; তবে আল্লাহ্ শুধু তাদের সম্বোধন করেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে। ফলে বিশ্বাসীগণ পুস্তক আকারে প্রকাশিত কুরআানকে ঠিকভাবে বুঝবে। বিশ্বাসীর সর্বোত্তম গুণ হলো উত্তম বিবেক ও সততা যা তাকে কুরআান বুঝতে অনুমতি দেয়।

যারা ধর্ম থেকে দূরে এবং যাদের আত্মিক অবস্থা ও চরিত্র বিশ্বাসীদের থেকে ফারাক তারা কুরআানকে ভুল বুঝবে এটাই স্বাভাবিক।

আমরা আগেও বলেছি আল্ কুরআান খুব পরিষ্কার, সহজ ও বোধগম্য ভাষায় লেখা হয়েছে, তবে এটা স্পষ্ট একমাত্র তাদের নিকট যারা শুদ্ধ বিবেকসম্পন্ন বিশ্বাসী । যাকে ইসলামের সাথে পরিচয় করানো হয়নি অর্থাৎ যে এখনো অবিশ্বাসী সে যদি পূর্বধারণা না পোষণ করে সততার

সাথে সর্বান্তকরণে বিশ্বাসীর মত অগ্রসর হয় তাহলে তার বিবেক বুঝতে পারবে যে আল্ কুরআন আল্লাহ্‌র ভাষ্য। শুভ মনসম্পন্ন যে কেউ দেখবে কুরআনের পদ্ধতি বা স্টাইলের চমৎকারিত্ব, এর পরিপূর্ণতা, স্পষ্টতা, অথবা এর উচ্চমার্গের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রজ্ঞা যা কোন মানুষের বক্তব্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারেনা; বরং এ হতে পারে কোন পবিত্র গ্রন্থ। কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ যদি কুরআনে আস্থা রাখে এবং বুঝার চেষ্টা করে তবে তার নিকট এর বিজ্ঞতা স্পষ্ট হবে। আল্লাহ্‌র বার্তাবহ মুহাম্মাদ (ছ-) বলেন, *"আল্লাহ্ কারও ভালো করতে চাইলে তাকে ধর্ম বোঝায় সক্ষম করেন এবং পড়াশুনা দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়।"(বুখ-রী ১/৬৭)।*

কুরআন কোমল হৃদয়ের মানুষকে নাজাতের দিকে ধাবিত করে; পক্ষান্তরে দূরস্থ মতলব পোষণকারী ও কুরআন বিদ্বেষীদের বিভ্রান্ত করে। যারা অন্যের থেকে ধার করা বিপথগামী তথ্য, মিথ্যা ব্যাখ্যা, মতলব আর নিজস্ব মূলমন্ত্রকে বিশ্বভাবনা ও জীবন দর্শনের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে তারা কুরআন বুঝবেনা বা এর উপকার পাবেনা। বস্তুত বিপরীতমুখি ব্যবহারের স্বাভাবিক পরিণতিতে কুরআন বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তি বাড়াবে। যেহেতু তারা কুরআন বুঝতে অক্ষম, সেহেতু তারা বোকামিপূর্ণ ও অযৌক্তিক আপত্তি তুলবে এবং বিকৃত ও নিরর্থক ব্যাখ্যা করবে। আয়াতে যেমন বলা হয়েছে **"...ইহা (কুরআন) একমাত্র ভুলকারীর লোকসান বৃদ্ধি করে"(সূর- ইসর-ইল ৮২)**আর সে কুরআন ও বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যায়।

পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে অমরা উল্লিখিত অবিচক্ষণ লোকদের কুরআনের আয়াত সম্পর্কে বোকামীপূর্ণ মন্তব্যের বিপরীতে প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যার তুলনা করবো।

কঠিন (মুতাশাবিহ্) পংক্তির সাথে প্রাঞ্জল (মুহ্‌কাম) পংক্তির তালগোল পাকানো

বিশ্বসীগণ যাতে কুরআনের অনুশাসনগুলো সহজে মেনে চলতে পারে সে উদ্দেশ্যে সেগুলো পরিষ্কার ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সকল

পংতিকে প্রাঞ্জল পংতি বা আয়াত (মুহ্কাম) বলা হয়। কুরআান মতে এগুলো কিতাবের শাঁস বা কুরআানের ভিত নির্মাণকারী। আরেক ধরনের পংতি আছে যা কঠিন(মুতাশাবিহ্), যার মধ্যে নানা ধরনের তুলনা ও উৎপ্রেক্ষা থাকে। কুরআানে অজ্ঞ অথচ দূরস্থ মতলববাজ মানুষ নানান বিকৃত ও চমকপ্রদ কায়দায় কঠিন আয়াতগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে। কুরআান বিষয়টিকে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছে:

ইনি (আল্লাহ্) তিনি, যিনি তাঁর থেকে তোমাদের জন্য পুস্তক প্রেরণ করেছেন : যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট বিধান সম্বলিত আয়াত - যে গুলো পুস্তকের শাঁস - আর অন্যান্য পংতি যা 'বিশদ ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত'। যাদের মনে মতলব রয়েছে তারা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ খোঁজার নামে 'ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত' পংতিসমূহ অনুসরণ করে। 'ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত' পংতির অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেনা। বদ্ধমূল জ্ঞানীরা বলে, 'এতে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। এর সব কিছু আমাদের প্রভুর থেকে।' কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তা সম্পন্নরাই মনোযোগ দেয়। (সূর- য়িঃমর-ন ৭)।

কঠিন পংতির অর্থ জানেন একমাত্র আল্লাহ্। তাঁর জানার বাইরের কোন ব্যাখ্যা এর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেনা। বিকৃত বুদ্ধির লোক, সম্প্রদায় ও আন্দোলনকারীরা তাদের বিকৃত উদ্দেশ্য হাসিল ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য বহুকাল ধরে কঠিন পংতির ব্যাখ্যা সুবিধা অনুযায়ী করে এসছে। উপর্যুক্ত আয়াত বা পংতি মালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে - এ ধরনের ব্যাখ্যা খোদাদ্রোহ; একমাত্র বিপথে চালিত মনের মানুষেরা ও সঠিক পথচ্যুত লোকেরা অপব্যাখ্যা কারসাজির আশ্রয় নিয়ে থাকে।

কঠিন পংতিগুলোর অর্থ যে একমাত্র আল্লাহ্ জানেন তা পংতিমালায় সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তিনি এর সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য তাঁর পছন্দের জনের নিকট অর্থ প্রকাশ করতে পারেন। বিশ্বাসীগণের নিকট দুর্বোধ্য পংতিমালার অর্থ প্রকাশ নাকরা সত্বেও তারা এ সকল পংতিমালা বরণ করে থাকেন। যারা দ্বন্দ্ব বা ফেৎনা দেখতে আগ্রহী আর যাদের হৃদয় বিকৃত তাদের ন্যায় বিশ্বাসীগণ পেচানো অর্থের প্রতি ঝোঁকেননা।

কুরআান ব্যাখ্যার কলাকৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব

আল্ কুরআান এক খানা অলৌকিক গ্রন্থ যা মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ধারণ করেছে; অপরিসীম বিজ্ঞতা থাকায় এ রকমটা ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। আর উর্ধ্বলোকের প্রজ্ঞা দ্বারা স্থাপিত হয়েছে বিধায় এ গ্রন্থের সীমিত সংখ্যক পংতি অসীমিত জ্ঞান ধারণ করেছে। এর চরণসমূহে ধারণকৃত অর্থ হতে পারে প্রকাশ্য, গোপন, পরস্পর বুননকৃত বা জড়ানো। পংতি গুলো যখন অন্যান্য পংতিমালার সাথে প্রতিক্রয়া করে তখন অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আনয়ন করে। এমনও দেখা যায় যে একটি একক চরণের ব্যাখ্যায় গোটা একখানা পুস্তক প্রয়োজন হতে পারে।

এ কারণে কুরআানকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করার ও এর বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু আয়ত্ত করার মতো দক্ষতা থাকতে হবে এবং ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয় কলাকৌশল আর নিপুণতা ও থাকতে হবে।

কুরআানের পরিপ্রেক্ষিত বুঝে প্রতিটি পংতি বিশ্লেষণ করা কুরআান বুঝার গুরত্বপূর্ণ কলাকৌশলের মধ্যে একটি। আবার বিষয়বস্তু অনুযায়ী কখনো কুরআানের পংতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যে কায়দায় একটি পংতি শুরু হয় এবং পরবর্তী পংতি দ্বারা অনুসরিত হয় তা অর্থ ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। ইসলামী সাহিত্যে পংতি সম্পর্কিত এ প্রসংগটিকে 'সিবাক্ব উ সিয়াক্ব'(শব্দের পূর্ণঅর্থ বর্ণনা) এর সাথে সম্পর্কিত। বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা নাকরে যে সমস্ত শব্দ দ্বারা পংতি নির্মাণ কৃত হয়েছে সে সমস্ত পংতির শব্দভিত্তিক অর্থ করা হলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে।

অজ্ঞতা বা বিকৃত ইচ্ছার কারণে কিংবা যে ভাবেই হোকনা কেন কুরআানের এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা যুগযুগ ধরে ইতিহাস জুড়ে রয়েছে এবং নিদৃষ্ট কিছু সম্প্রদায় কুরআান সম্পর্কে দুরন্ত মতলব ভিত্তিক নানা কুৎসা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অন্য একটি গরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো কোন বিশেষ পংতিমালায় ব্যবহৃত শব্দের প্রেক্ষিত বিবেচনায় ব্যাখ্যা করা। কুরআনী শব্দাবলীর মধ্যে অধিকাংশের বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে। কুরআনী শব্দের অর্থ কোন কোন সময় কুরআানের অন্যত্র শব্দের ব্যবহার থেকে নেয়া যেতে পারে। সময় সময় এক শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। সুতরাং এরকম শব্দের অর্থ কুরআানের বিভিন্ন অধ্যায়ে শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে গ্রহণ করতে হয়। শব্দটিকে অভিধানে দেখে এর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করে আমরা যে ফল পেতে পারি তা চূড়ান্ত ভাবে যথার্থ ব্যাখ্যা নাও হতে পারে; এমনকি কখনো প্রকৃত অর্থের বিপরীত হতে পারে। ফলে কুরআানকে স্ববিরোধী মনে হতে পারে। আবার কোন সময় এক পংতির ব্যাখ্যা অন্য কোন পংতির বা পংতিমালার ভিতর লুক্কায়িত থাকতে পারে।

কুরআান ব্যাখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো কুরআানের নির্যাস পরিপূর্ণ ভাবে আত্মস্ত করা। কুরআানকে আত্মস্ত করতে হলে একে সার্বিক ভাবে দেখতে হবে। অধিকন্তু, কুরআানকে বিশ্লেষণ করতে হবে অনেক পংতির আলোকে যা আল্লাহ্‌র মহত্ম, অসীম দয়া, সহানুভূতি ও ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ করে।

যেহেতু কুরআান একখানা আসমানী গ্রন্থ সেহেতু তা অন্য কোন গ্রন্থ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির; সুতরাং অন্য কোন গ্রন্থের সাথে এর তুলণা চলেনা। এর নিজস্ব অদ্বিতীয় ভঙ্গী রয়েছে। তাই কুরআান, বিশেষ করে কুরআানের দুর্বোধ্য পংতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করার জন্য এর অন্তর্গত নির্যাসসহ সার্বিক ভঙ্গী উপলব্ধি করতে হবে। আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত নানা তথ্য বা ঘটনা সঠিক ভাবে বুঝার জন্য কুরআানের আত্মিক দিক মনে রেখে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

আরবী সম্পর্কিত অপর্যাপ্ত জ্ঞান

আল্লাহ্‌ বলেন যে তিনি আরবী ভাষায় লিখিত কুরআান প্রেরণ করেছেন। অন্য ভাষায় এর অনুবাদ তখন পর্যাপ্ত হবে যখন মৌলিক ধারণা বুঝার (যেমন - আল্লাহ্‌ সম্পর্কে জ্ঞান, বিশ্বাসের প্রধান সূত্রাবলী ও এদের প্রয়োগ, এর থেকে পথনির্দেশ অন্বেষণ ও চিন্তা গবেষণা করার) প্রয়োজন

অনুভূত হবে। তারপরও কোন অনুবাদ কোন ভাবে কুরআনের মূল ভাষার সমকক্ষ হবেনা। এমনকি সরাসরি শব্দ থেকে শব্দে অনুবাদ করার ক্ষেত্রেও অনেক শব্দ হারিয়ে যাবে; অনুরূপ ভাবে অনেক অর্থও ফসকে যাবে। কেননা অনেক আরবী শব্দ অন্য ভাষায় ব্যকরণগত ভাবে যথার্থ রূপে খাপ খাওয়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলা হয়, 'কুরআান অনুবাদ' এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণার বেশী কিছু দেয়না এবং এর আয়াত সমূহের প্রকৃত অর্থ পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করেনা।

সতরাং, যদি এর মূল ভাষা আরবীতে কুরআান চর্চা করা না হয় তবে এর কাঠিন্য বোঝার ক্ষমতা মারাত্মক ভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্য ভাষায় অনুবাদ থেকে কুরআানের পংক্তিমালা বিশ্লেষণের চেষ্টা সবসময় যথার্থ নাও হতে পারে। বস্তুত পক্ষে, এ ধরনের চেষ্টা এর অর্থ ও অভিপ্রায়কে বিকৃত করতে পারে। কোন আরবী শব্দের মূল অর্থ ও অপরাপর অর্থ না জেনে অনুবাদের বেলায় কোন শব্দের একটি অর্থের বা সমঅর্থের শব্দের উপর নির্ভরশীলতায় সমগ্র আয়াতের ভুল অর্থ করা হতে পারে। ফলস্বরূপ, বেশি খারাপ ক্ষেত্রে, মূল অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যা পর্যন্ত হতে পারে।

বিশ্বের সমৃদ্ধতম ও গভীরতম ভাবে গ্রন্থিত ভাষা সমূহের মধ্যে আরবী ভাষা একটি। এ ভাষা প্রবল ভাবে ভাবপূর্ণ; অধিকন্তু, এর বিশাল শব্দভান্ডার রয়েছে। তবে, আরবী ভাষায় লেখার কারণে যদি দাবী করা হয় যে 'কুরআান আরবদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে' আর আরবরা এর উদ্দিষ্ট জাতি; তাহলে কুরআানের আদর্শিকতার বিচারে এ ধারণা বিষম হবে। এ কথা সর্বজন বিদিত যে কুরআানকে গুরুত্ব দেয়ার একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহ্ ভীতি (তাক্বওয়া) যা কারো নিজ উৎকৃষ্টতা ও নিজের প্রতি আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রকাশ করে। উপরন্তু, সূর- ছ্ব-ৱ্ব পংক্তি-৮৭ এ বলা হয় কুরআান হলো 'মানুষের জন্য তাগিদ।' তবে অজ্ঞদেরকে প্রভাবান্বিত করা আর ইসলামকে ধ্বংস করা যাদের উদ্দেশ্য তারা দাবী করে যে ইসলাম শুধুমাত্র আরব জাতির ধর্ম। এ কথা কতখানি ভিত্তিহীন ও ইচ্ছাকৃত ভাবে আরোপকৃত সে বিষয় বুঝার জন্য কুরআান পাঠই যথেষ্ট।

খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ও বুঝের অনুপস্থিতি

কুরআানের আয়াতে বলা হয়েছে যে কুরআানের সঠিক অর্থ উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রজ্ঞা, বুঝ ও উপলব্ধির ক্ষমতা থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ্ বিন য়ু:মার এর বর্ণনা মতে আল্লাহ্র বার্তাবহ নবী মুহ:াম্মাদ (ছ-) বলেন, *"দুটি ক্ষেত্রে ব্যতীত কারও মতো হতে চেওনা - এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা সঠিক পথে ব্যয় করে; আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ ধর্মীয় জ্ঞান দিয়েছেন (কুরআান ও সুন্নাহ্র জ্ঞান) আর সে অনুযায়ী সে ফয়সালা করে ও অন্যদের শিক্ষা দেয়।"(বুখ-রী ৯/৪১৯ ও ৬/৫৪৩)।*

কুরআান ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য মনে করা হয়, যেমন- ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন পদ্ধতির জ্ঞান এবং আরবীর দক্ষতা দ্বারা কুরআান সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান। তবে এসব সত্ত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ এ কল্যাণ পাবেনা। কাজেই কুরআান সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা যথেষ্ঠ নয়। ইতিহাস জুড়ে এ রকম বহু জ্ঞানসম্পন্ন লোক আছে যারা কুরআানের প্রতি বাঁকা পথে অগ্রসর হওয়ার দায়ে পড়েছে। বহু বিকৃত ধর্মীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা যারা স্বস্ব ক্ষেত্রে পারদর্শী গণ্য হলেও প্রকৃত পক্ষে স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত। এ সব লোকেরা এবং এদের অজ্ঞ ও অন্ধ অনুসারীরা ইসলামের সঠিক চর্চা থেকে নিজদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

স্মরণীয় যে নবী মুহ:াম্মাদ(ছ) এর সময়ে মক্কার মুর্তিপূজকগণ (মুশ্‌রিকগণ) আরবী জানতো, আরবী ভাষায় কুরআান পড়ত কিন্তু তারা কুরআান বুঝতনা এবং কুরআান অস্বীকার করত - এ ঘটনা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে একমাত্র আরবী ভাষা জানাটাই কুরআান বুঝার জন্য যথেষ্ঠ নয়।

আল্লাহ্র নিকট থেকে বুঝার ক্ষমতা অর্জনের প্রথম শর্ত হলো তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি অকপট থাকা। শুধুমাত্র এ পৃথিবীর আনন্দে মজে থেকে এ বুঝ অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্কে নাখোশ করার উদ্দেশ্যে যাচাইকারীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কুরআানের দিকে অগ্রসর হলে তা ভ্রমাত্মক বুঝ ও ব্যাখ্যার দিকে পরিচালিত করে। নিজ মতলবের প্রতি নিবেদিত

কেউ কুরআনের মর্ম উদ্ধার করার মতো সঠিক মনের অবস্থা খুঁজে পায়না বরং এর সুক্ষ্ম দিক, রহস্যময়তা ও গভীরতায় হাতরে বেড়ায়। স্বীয় মতলব অনুসারী যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আর অতিরঞ্জিত দৃষ্টিতে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করে। উপরন্তু, সে কুরআনের স্বর্গীয় অলৌকিকত্ব দেখতে ব্যর্থ হয়।

এছাড়া, আত্মবুঝ অনুসারী নিজ অহম ও সুবিধা অনুযায়ী কুরআন ব্যাখ্যায় আগ্রহী হয় বিধায় তার পক্ষে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য অনুযায়ী আয়াতের অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়না। আত্মমগ্ন ব্যাক্তি বুঝার ক্ষেত্রে কি রকম অক্ষম হয় তা কুরআনের এক পংতিতে বলা হয়েছে:

তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার অভিভাবক হবে? তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? ওরাতো পশুর মতোই; বরং ওরা অধিকতর পথভ্রষ্ট! (সূর- ফুরক্বন ৪৩-৪৪)।

উল্লিখিত ধরনের লোকেরা কুরআনে মনোনিবেশ করাকে অধিক কঠিন অনুভব করে। এমন ও হতে পারে যে অন্যরা যে বিষয় অতি সাধারণ মনে করে তাদের কাছে তা বোধগম্য হয় না। তারা পংতির সাথে পংতির বা পংতির সাথে ঘটনার প্রয়োজনীয় সম্পর্ক সংস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং তারা যে সমস্ত আয়াত বুঝতে অক্ষম হয় সেগুলোকে পরস্পর বিরোধী বলে ঘোষণা করে। তাদের মন এত অপরিসর থাকে যে তাদেরকে পশুর অধম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

চিন্তা ভাবনার অভাব

কুরআন বলে যে এর বিষয়বস্তু সুষম ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য চিন্তা ভাবনা ও গভীর মনোনিবেশ প্রয়োজন। কুরআনকে যদি আধাআধা মনোযোগ দেয়া হয় বা অন্য কোন সাধারণ বইয়ের মতো পড়া হয় তাহলে এর অশেষ জ্ঞানের উৎস থেকে যথাযথ কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হয়না। আল্লাহ্‌ পাক মানুষকে সর্বক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার জন্য কুরআনে আহ্বান জানান। কুরআনকে যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং এর অর্থ বুঝতে,

সূক্ষ্মমর্ম উদ্ধার করতে, অলৌকিকতা ও রহস্য আবিষ্কার করতে চিন্তাভাবনা ও স্বীয় অন্তরের যুক্তি প্রয়োজন। কুরআান প্রত্যেকের নিকট নিজ নিজ পরিচয়, তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য, এ বিশ্বের সঠিক প্রকৃতি, চারদিকে যা কিছু ঘটে তার কারণ সহ তার ও তার পারিপার্শ্বিক অনেক অনেক বিষয় তুলে ধরে। সুতরাং, সে অনুযায়ী নিজের সাথে, চারদিকের পরিবেশ ও নানা ঘটনার অভিজ্ঞতার সাথে পংতিমালার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করাসহ কুরআান বুঝার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা করা উচিৎ। কুরআান ঘোষণা করে যে চিন্তাশীল বা চিন্তা ভাবনাকারীদের জন্য কুরআান প্রকাশ করা হয়েছে: **এটাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। (সূর- আন-য়াম ১২৬)। ... এভাবে আমাদের নিদর্শনাবলী চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বিবৃত করি। (সূর- ইউনুস ২৪)।**

যেহেতু চিন্তাশীলদের জন্য আয়াতসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে সেহেতু যারা চিন্তা ভাবনা করেনা তারা কুরআানের কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে পারবেনা।

এ কথা সত্য যে নিজ ও পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনার অভিজ্ঞতায় মানুষের জীবন পরিপূর্ণ। মানুষ নিজ জীবনের নানা ঘটনাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে এবং ব্যাখ্যা বা বুঝ অনুযায়ী কি রূপ প্রতিক্রিয়া করবে কুরআান সে সম্পর্কে পথনির্দেশ দেয়। সুতরাং কুরআান হলো সে বাতিঘর যা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন নির্ধারণ করে এবং তার অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যাখ্যা করে। অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মালিক আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অনুযায়ী যথাযথ মনোযোগ দিয়ে কুরআান অধ্যয়নকারী কুরআানের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে। এর আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে কুরআানে আন্তরিক ভাবে মনসংযোগ করতে হবে এবং কুরআানকে পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করতে হবে। **এ এক কল্যাণময় কিতাব, আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। (সূর- ছ-দ ২৯)।** অধিকন্তু কুরআান সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তা করতে গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে:

তবেকি ওরা অনুধাবন করেনা? কিংবা ওদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষের নিকট আসেনি? (সূঃ- মুঃমিনুন ৬৪)।

কুরআান অশেষ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উৎস: কারণ, মহা বিশ্বের প্রভু - আল্লাহ্ কুরআান প্রেরণ করেছেন। কুরআান আল্লাহ্র গুণ থেকে তাঁর সৃষ্টির বিস্ময় পর্যন্ত, মানব আত্মার জটিলতা থেকে বিশ্বের ও আখির-তের এবং অনুরূপ অনেক কিছুসহ অসংখ্য বিষয় পরিবেষ্টন করেছে। সতরাং, এরকম শুদ্ধ ও দরকারি ভাষাবদ্ধ ব্যাপক তথ্যের মূল্যায়ন করা একমাত্র গভীর চিন্তা, সচেতনতা, বিস্তারিত বিষয়ে মনোযোগ, নিষ্কলুষ হৃদয় ও মজবুত বিবেকের সংমিশ্রণে সম্ভব।

অহমিকা ও শ্রেষ্ঠত্ব

অহমিকা কুরআান বুঝা থেকে নিবৃত্ত করে। অহমিকা সম্পন্ন ব্যক্তি নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করে; তাই তার মধ্যে কুরআানের দিকে যথাযথ ভাবে অগ্রসর হওয়ার মতো বিনয় ও সচেতনতা থাকে না। বান্দা হিসেবে তার দুর্বলতাসমূহ আয়াতগুলো স্মরণ করায় যা তার পক্ষে সহ্য করাও সম্ভব হয়না। কিন্তু বাস্তবতা হলো - সে নিজ গুণসহ যা কিছু পেয়েছে তা অল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন। যাহোক, সে স্রষ্টার সতর্কতা ও নির্দেশনার অধীনে নিজকে সমর্পণ করতে পারেনা আর যাকিছু নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে নিজকে দূরে সরাতে পারেনা কিংবা আল্লাহ্র প্রজ্ঞার তলে নিজকে সমর্পণ করতে পারেনা। তার গর্ব আর কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে অনুরূপ করা থেকে বিরত করে। একারণে তার অহমিকা নির্ভর চরিত্রের প্রতি কুরআানকে এক হুমকি বলে মনে হয়। অতঃপর সে সর্বশক্তি দিয়ে কুরআান বিরোধী পথের অনুসন্ধান করে আর এ জন্য আয়াত সম্পর্কে তর্ক করে। কুরআানে বলা হয়েছে যে গর্বকারীরা এর আয়াত বুঝতে পারবেনা।

এ পৃথিবীর বুকে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় আমি তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রাখবো, প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তারা তাতে ঈমান আনবেনা, তারা যদি হেদায়েতের পথও দেখতে পায় তবুও সে পথকে তারা নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করবে না; তবে ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকেই নিজেদের জীবনপথ রূপে গ্রহণ করবে, এর কারণ হলো,

তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী ছিল। (সূর- য়:ার-ফ ১৪৬)

কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কান বধির করেছি; তুমি তাদের সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবেনা। (সূর- কাহ্‌ফ ৫৭)

নিজ বুদ্ধিমত্তা, কৃষ্টি, জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মর্মে প্রদর্শন করার একটি হাতিয়ার হলো অহমিকা। সুতরাং অহমিকা সম্পন্ন লোকের সম্পাদিত কার্য যেমন, শিক্ষা সম্পর্কিত অগ্রগতি, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা তাকে কুরআান থেকে দূরে সরাতে ভূমিকা রাখে। অহমিকা যে কুরআানকে যথাযথ ভাবে বুঝা থেকে দূরে সরায় তার প্রমাণ তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের কুরআান সম্পর্কিত প্রজ্ঞাহীন দাবির মধ্যে পাওয়া যায়। এ ধরনের মানুষের কথা বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত আছে:

নিজেদের নিকট কোন দলিল না থাকা সত্বেও যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূর- মু:মিন ৫৬)

যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ এমনভাবে অহংকারে অটল থাকে যেন সে তা শুনেনি। তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (সূর- জাসিয়হ্ ৮)

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কুরআান বুঝতে হলে শালীনতা বোধ, বিনয় ও আনুগত্য গুণ থাকতে হবে; আর স্রষ্টার বিশালতার তুলনায় মানুষ যে কিছু নয় সে বোধ নিয়ে তাঁর নিকট পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে কুরআানকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা

কুরআানকে ব্যাখ্যা করার সময় শ্রুতি, পূর্বপুরুষের কুসংস্কার এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধর্মের বাণী বলে দাবী করা দ্বারা অন্যতম ভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। যে সমস্ত লোক এগুলো করে তারা কুরআান নয় বরং তাদের রীতি বা ঐতিহ্যগত ধর্ম অনুসরণ করে এবং একই সাথে তাদের বিকৃত

ধর্মের সাথে কুরআনকে খাপখাওয়াতে চেষ্টা করে। তাদের এ পেচানো মানসিকতা সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর;' তারা বলে- 'আমরা তারই অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পেয়েছি;' যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামী ছিল না! (সূর- বাক্ব-র-রহ্ ১৭০)

অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ধর্ম সংশ্লিষ্ট পেচানো বা বিকৃত বিশ্বাস এমন একটি মডেল এগিয়ে দেয় যা ইসলামী বিশ্বাস থেকে পৃথক; এমনকি বিপরীত। ইসলামের নামে চালুকৃত এ মডেল বা প্রতিরূপের সাথে কুরআনে বর্ণিত সঠিক ধর্ম, নীতি বিজ্ঞান, জীবন শৈলীর কোন সম্পর্ক নেই। ঐতিহ্য ও প্রাচীণ ধারার কুসংস্কারের উপর এ মিথ্যা মডেল প্রতিষ্ঠিত; কুরআনের উপর নয়। এ পেচানো বা মোড়ানো বিশ্বাস চর্চার অনুসারীগণ তাদের ঐতিহ্য ও কুসংস্কারের সাথে কুরআনকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এ ধরনের নির্বোধ কথাবার্তা দ্বারা কুরআন ব্যাখ্যা করা স্পষ্টত অসম্ভব। প্রসঙ্গত, কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষকে কুরআন থেকে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যে **"জিহ্বা দ্বারা গ্রন্থ বিকৃত করে"** মিথ্যা উদ্ভাবন করা হয়েছে ।

এ সব লোকেরা যখন তাদের অভিপ্রায়, ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগকে প্রত্যায়িত করে তখন ধারণা দেয়, তারা কুরআনের উপর ভিত্তি করে এসব করছে; প্রকৃতপক্ষে, কুরআন সত্যিকার অর্থে যা বলে তা থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে। তাদের এসব ভিত্তিহীন দাবির বিপরীতে তারা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করতে পারেনা। কুসংস্কার প্রনোদনকারীগণ বাস্তবে ভাল করে জানে যে কুরআনকে তাদের বিকৃত ব্যাখ্যার কাজে যুতসই করা যাবেনা, তাই তারা মানুষদেরকে এ গ্রন্থ থেকে দূরে সরাতে পারলে পরিতৃপ্ত হয়। সতর্কতা ও দৃঢ় বিবেকসহকারে কুরআন পাঠ করলে এ সব পেচানো বা মোড়ানো বিশ্বাসের মুখোশ উন্মোচিত হবে। এ ছাড়া যারা এরকম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিকৃত ধর্মের ভিত্তিতে তাদের জীবন চালায় ও সুবিধা ভোগ করে তাদের মর্যাদা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে।

কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা থেকে যারা দূরে, অধিকন্তু, যারা অজ্ঞ বা ভুল ব্যাখ্যা করে সঠিক পথ থেকে লোকদেরকে সরিয়ে দিতে চায় তাদের অবস্থা সম্পর্কে কুরআন নিম্নবিবরণ দেয়ঃ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় বা যোগাড় করে এবং এ রকম লোকের পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে; তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি আছে। যখন এদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তারা দম্ভ ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে এটা শুনতেই পায়নি, যেন তার কর্ণ দু'টি বধির; অতএব, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (সূরা- লুকমান ৬-৭)

স্পষ্টত, অজ্ঞ ও অন্ধ অনুসারীসহ যাদের এ রকম মোড়ানো উদ্দেশ্য আছে ও দুইয়ের মধ্যে মতৈক্যে আছে তারা উভয় দল কুরআনের প্রতি এভাবে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সমদৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের নিকট যে পংতিগুলো অতীব সহজ সেগুলো ব্যাখ্যা করতে তারা বিকৃত পন্থায় উদ্যোগ নেয়। এ রকম করে তারা কুরআনের সাথে তাদের মোড়ানো ধর্মের সংযোগ সাধনের চেষ্টা করে।

এ রকম চাতুর্যপূর্ণ প্রবণতা এদের অনুসারীদের এ জগতে ও পর জগতে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। একই সাথে, অপর্যাপ্ত ধর্মজ্ঞান সম্পন্নদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুৎ করার কারণ হবে আর স্রষ্টার নিকট ঘনিষ্ট হওয়াকে প্রতিরোধ করবে। এরা চরম বিভেদের স্ফুলিঙ্গ ধরাবে ও তাদের মতো অজ্ঞদেরকে অধিক হারে নিজদের দলে আকর্ষণ করে ধর্মের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। যাহোক, মিথ্যার বিপরীতে সত্য সবসময় জয়ী হবে, কেননা কুরআন আমাদের যেমনটি জানায় **" মিথ্যা সর্বদা উবে যেতে বাধ্য।"** যেহেতু উবে যাওয়াটা নির্ধারিত,তাই কেউ তা ঠেকাতে পারেনা। কুরআন শ্বাশ্বত ও পরিষ্কার। আল্লাহ্‌র ঠিক পথ পাওয়ার উদ্দ্যেশ্যে যে কেউ উদার মনোভঙ্গী নিয়ে কুরআনকে আকড়ে ধরবে সে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে সঠিক পথ কি তা শিখতে পারবে, সে পরিত্রাণে পৌছবে ও অনুগ্রহ প্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে।

ধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বল প্রয়োগ নেই; নিশ্চয় ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে; অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদে অবিশ্বাস

করে সে দৃঢ়তর রজ্জু আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবেনা। আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোয় নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে শয়তান তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। (সূর- বাক্-র-হ্ ২৫৬-২৫৭)

কুরআনের বিজ্ঞানসম্পর্কিত আয়াত বুঝায় অক্ষমতা

কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। স্রষ্টার পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায় সৃষ্টি, মানব জাতি সৃষ্টি থেকে শুরু করে বৃষ্টি সংঘটন, বিভিন্ন মহাদেশিক ভ্রমণসহ অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন কোন বিজ্ঞানের বই নয়। তবে অনেক সময় অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য স্বচ্ছ ও মধুর ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে; আবার কোন সময় তুলনা, ইংগিত বা অন্ত র্নিহিত ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা না রাখা কিম্বা নিগুঢ় উপলব্ধি না রাখা কিছু মতলববাজ এ সকল আয়াতের গভীর জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে শেষপর্যন্ত কুরআনের বিরুদ্ধচারণ করে।

একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আজও, সর্বাধুনিক প্রযৌক্তিক পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা কুরআনে উল্লিখিত নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যের অত্যাদ্ভুৎ সত্যায়ন দেখছে। অধিকন্তু, গত দু'শতাব্দীর আগে বিজ্ঞান শ্রুতি ও অপ্রমাণিত তত্ত্ব দ্বারা শাসিত হতো; কিন্তু প্রায় ১৪০০ বছর আগে লিখিত কুরঅআান যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছে আজ শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে প্রমাণিত হচ্ছে।

বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন, বিগ ব্যাং, বিশ্বের সম্প্রসারণ, সময়ের আপেক্ষিক সর্ম্পক, মহাদেশিক বিচরণ ইত্যাদি প্রায় ১৪০০ বছর আগে প্রকাশিত কুরআনে উল্লেখিত আছে (বৃহৎ বিশ্লষণের জন্য দেখুন মিরাকল্স অব কুরআান – হারুন ইয়াহিয়া)। যাহোক, যে সমস্ত পংতি গোপন ও গভীর জ্ঞান বহন করে মসলমানগণ তা না বুঝেও কুরআান

যেমন বিশ্বাস করে তেমনি করেই সে গুলো বিশ্বাস করে। তারা কোন সন্দেহ ব্যাতিরেকে বিশ্বাস করে যে কুরআন সে 'সত্য' (হক) যা স্রষ্টা প্রকাশ করেছেন। যারা নিজ নিজ যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে এবং গভীর ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম তারা প্রত্যেকটি আয়াতকে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অংশ গণ্য করে। এ কথা সত্য যে এখনও কিছু আয়াত রয়েছে যার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যার বাকি আছে এবং প্রকৃত রহস্য এখনো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য এসব আয়াত গভীর আগ্রহ ও উত্তেজনার উৎস। এ অপ্রকাশিত জ্ঞান তাদেরকে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞনের সাথে পরিপূর্ণ ভাবে সংযক্ত হওয়ার অনুভূতি দান করে।

বিদ্যমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা যে সকল আয়াতের অর্থ এখনও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি মতলববাজরা সে সকল আয়াতের প্রতি চিরাচরিত ভাবে সন্দেহ ছড়াতে চায়। এদের সম্পর্কে কুরআন বলে:
যখন তারা সমাগত হবে তখন (আল্লাহ) বলবেন, 'তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে না পেরেও আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে? তোমরা আসলে কি করছিলে ?' (সূর- নামল ৮৪)

এ সব লোকেরা কুরআনের প্রতি মতলব নিয়ে অগ্রসর হয়, আর যে সব আয়াতের অর্থ তাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা আবিষ্কার করতে পারে না, কুরআনের অসামঞ্জস্য প্রমাণের জন্য তারা বাধ্য হয়ে সে সব আয়াতই তুলে ধরে; কারণ, তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো কুরআনের মধ্যে অসামঞ্জস্য খুঁজে বেড়ানো। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে ধন্যবাদ; কারণ, তা কুরআনের অনেক রহস্যময় আয়াতের অর্থ আবিষ্কার সম্ভব করেছে; তবু এখনও অনেক আয়াত ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞনিক আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণের অপেক্ষায় ছায়াতলে রয়েছে। উদহারণ সরূপ,কুরআন সম্ভবত বস্তুর সাথে গন্ধ বদলের ইংগিত দেয়। যদিও আজকের প্রযুক্তির নিরীখে এখন অসম্ভব প্রতিভাত হলেও, বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনীতে এ রকম ধারণা হাজির করা হয়। এ ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত নিম্নে দেয়া হলো:
তিনি (সুলাইমান) বললেন, 'হে পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বেই তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?'

এক শক্তিশালী জ্বিন বললো, 'আপনি আপনার আসন হতে উঠবার পূর্বেই আমি ওটা আপনার নিকট এনে দিবো। এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত।'
যার কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বললো, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিবো।'
যখন ওটা তিনি (সুলাইমান) সামনে সংস্থাপিত দেখলেন তখন তিনি বললেন, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় (সে জেনে রাখুক) আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত মহানুভব।' (সূর- নাম্‌ল ৩৮-৪০)।

অনেক মাইল দূর থেকে পিতা নবী হযরত ইয়াকুব (য়:া) পুত্র নবী হযরত ইউসুব(য়:া) এর উপস্থিতি টের পেলেন:
এবং যাত্রীদল যখন (মিশর হতে) বের হয়ে পড়লো তখন তাদের পিতা (কেনান থেকে) বললেন, 'তোমরা আমাকে দিশেহারা মনে না করলে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' (সূর- ইউসুফ ৯৪)

এটা নিতান্ত স্বাভাবিক যে কুরআনের কোন কোন পংতিমালার কার্যকারিতা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং এদের মধ্যে থাকা তথ্যাবলী সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে; অধুনা প্রাপ্ত প্রযুক্তি যা এখনও উদ্দিষ্ট স্থলে পৌছেনি তা পরিপক্ক হলে ও পরিপক্ক প্রযুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত হলে আনেক কথা ভবিষ্যতে বোধগম্য হবে। যাহোক, যেহেতু বিজ্ঞানের আরও অগ্রযাত্রা ঘটছে সেহেতু কুরআনের আয়াতের নিগুঢ় অর্থও স্পষ্টতর হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ত্রুটিযুক্ত মূল্যবোধ অনুযায়ী কুরআনকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা

যেমনি আধুনিক কালের তেমনি আধুনিক সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে বসবাসকারী কেউ কেউ অধিকাংশ লোক কর্তক সতসিদ্ধ বলে গৃহীত নিয়মকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে এবং সেমতে কুরআনকে ব্যাখ্যা করে।

স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প মর্জিত হওয়া সত্বেও এরা কুরআান বিরোধীদের সংখ্যা বাড়ায়। প্রত্যেক পেশায় ও সমাজের প্রত্যেক জায়গায় এদের দেখা পাওয়া যায়। এরা এমন একটি সংখ্যাগুরু দল বানায় যারা গভীরভাবে চিন্তা করেনা বা একটি নিদৃষ্ট বৈশ্বিক ধারণা পোষণ করে, বৈশ্বিক কর্মকান্ডে নিবিষ্ট থাকে এবং পার্থিব জীবনোপকরণের পিছনে লেগে থাকে। যেহেতু তারা হাল্কা আনন্দ, ক্ষুদ্র হিসাব ও লাভ নিয়ে ব্যস্ত সেহেতু তারা কুরআানকে তাদের তথাকথিত স্বাধীনতার প্রতি হুমকি বা স্বাধীনতা সীমিতকারী মনে করে। যে হালকা জীবন প্রণালী বা আশার মধ্যে বাস করছে তা সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে মর্মে এরা আশঙ্কা করে । সুতরাং এরা এদের আদিম যুক্তি নিয়ে কুরআানকে প্রতিরোধ করে।

এ দলের সদস্যরা নিজদের মূল ধারণা থেকে নয় বরং অন্যদের থেকে শুনে কুরআান সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করে। সাধারণত এরা কুরআান সম্পর্কে অযৌক্তিক ও অজ্ঞ মন্তব্য করতে গিয়ে কিছু প্রারম্ভিক কথা দিয়ে শুরু করে," ২১ শতাব্দিতে....","আমাদের দিনে বা যুগে....","মহা শূন্য যুগে....","পশ্চিমা বিশ্বে...." ইত্যাদি।

তারা দাবী করে যে কুরআানে বর্ণিত জীবন ধারার সাথে নিজ সময়ের জীবন ব্যবস্থার সংগতি চলেনা; বাস্তবিক অর্থে কুরআানে বর্ণিত জীবন সেকেলে; এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা শেষপর্যন্ত কুরআান সম্পর্কে অসত্য কথা উদ্ভাবন করে। উদাহরণ, তারা দাবী করে যে সিয়াম-ছলাহ্ বা রোযা-নামায আধুনিক জীবনকে বাধাগ্রস্থ করে, বর্তমান অর্থব্যবস্থায় ইসলামে নিষিদ্ধ সুদ বাদ দেয়া সম্ভব নয়; এমন কি বর্তমান যুগে কুরআানে নিষিদ্ধ ব্যাভিচার নাঠেকাতে পারাও কুরআান বাস্তবায়নে অসম্ভাব্যতার প্রমাণ বলে দাবি করে।

এরা প্রার্থনা বিষয় ও কুরআানে উল্লিখিত আদেশ নিষেধ পর্যালোচনা কালে ভাসাভাসা যুক্তি দেয় আর নিজদের ব্যাপক অজ্ঞতা ফুটিয়ে তোলে। কোন কোন আদেশের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা না বুঝে বা কোনকোন আয়াতের অর্থ না ধরতে পেরে এসবের নিগুঢ়তা বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে। আরো খারাপ হলো, তাদের অযৌক্তিক দাবীর পক্ষে তারা ব্যাপক হিংস্রতা

দেখায়। তাদের দাবী প্রমাণের জন্য তাদের এ আচরণ যুক্তি বা কার্য-কারণের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারণার উপর নির্ভরশীল।

"জীবনের বাস্তবতা" কে একমাত্র অবিমিশ্র সত্য মনে করে তারা বিদ্যমান জীবনধারা ও বৈশ্বিক-দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে আর এ সূত্রের দ্বারা কুরআানের ভুল ও অসংগতি খোঁজে। বিচারের মাপকাঠি হিসাবে তারা যা ব্যবহার করে তার কোন বৈজ্ঞনিক বা যৌক্তিক মূল্য নেই। 'জীবনের বাস্ত বতা'র নামে ভুলকে অবিমিশ্র সত্য বলে ধরে নেয়া; বা বর্তমান যুগের চাহিদা বলে বিভ্রান্তিতে আশ্রয় নেয়া ও নিজদের প্রতারিত করা; আর একে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়া এদের কাজ।

কুরআান আমাদের ঐ সব লোকের বিকৃত পথের কথা জানায় যারা সংখ্যা গরিষ্ঠদের অংশীদার হয়ে সকলের শক্তি একত্রিত করে, আর ভাবে যে তারা সঠিক পথে আছে; কেননা তারা সবার সাথে একত্রে শান্তিতে আছে : **পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথায় তুমি চললে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা তো নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে, তারা শুধু ধারণা করছে। (সূর- আনয়ঃাম ১১৬)**

==========

কুরআনের ভুল ব্যাখ্যার উদাহরণ

বেহেশ্‌তে মদ্য পান

বেহেশ্‌তে মদ পরিবেশন করা হবে বলা সত্বেও পৃথিবীতে মদ্যপান নিষদ্ধ করার মধ্যে অজ্ঞ লোকেরা অসঙ্গতি পায়; এ সম্পর্কিত পংতিমালা পড়া যাক:– **মুত্তাকীদের নিকট যে জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো সেখানে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুধের নহরসমূহ, সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ আর সেখানে থাকবে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভূড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে এরাকি (মুত্তাকীগণ) তাদের মতো? (সূর- মুহ:াম্মাদ ১৫)**

ইতঃপূর্বে বলেছি যে যখন কোন মতলববাজ বিকৃত ইচছার কারণে যুক্তি প্রদর্শনে অক্ষম হয় এবং কুরআনকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তখন এ ধরনের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এ অবিবেচনা প্রসূত ধারণা যে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন এবার আমরা তা বিভিন্ন কোণ থেকে ও পীরক্ষা করে দেখবো।

প্রথমত, বেহেশ্‌তে পরিবেশিত পানীয় ও পৃথিবীর পানীয়র মধ্যে নিম্ন লিখিত আয়াতে আমরা পার্থক্য দেখি:
পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে তাদের সেবায় ঘুরা ফেরা করবে (চির কিশোরেরা), সে সুরা পানে তাদের শিরপীড়া হবে না বা তারা জ্ঞান হারাও হবে না-(সূর- ওয়াক্বিয়া ১৮-১৯)। দেখা যাচ্ছে, বেহেশ্‌তে পরিবেশিত পানীয়তে পৃথিবীর পানীয় মদের মতো কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই। আয়াতের বিবরণ অনুযায়ী তা মাথা ব্যথা বা মন বিভ্রান্ত করেনা। এর অর্থ দাঁড়ায় যে যদিও জান্নাতের পানীয় আনন্দ দেয় কিন্তু তা কোন রকম মাতলামী বা অসুস্থতার কারণ হয়না। সুতরাং বেহেশ্‌তে পরিবেশিত পনীয়র মধ্যে কোন রকম অসংগতি নেই।

অন্য দিকে পৃথিবীর সুরাযুক্ত পানীয় সম্পর্কে কুরআান সবসময় বলে চলছে যে এর অনেক ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর দিক রয়েছে। সুরা যুক্ত পানীয়র নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু আয়াত:

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং শুভ-অশুভ নির্ণয়ের তীর নোংরা ও শয়তানের কাজ। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমরা সফলকাম হও। (সূর- মায়িঃদাহ্ ৯০)

শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও নামায হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে, তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?
(সূর- মায়িঃদাহ্ ৯১)

মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। বল,'এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কিছু কিছু উপকার আছে, কিন্তু উপকার অপেক্ষা পাপই গুরুতর।' (সূর- বাক্-র-হ্ ২১৯)

মদের যে সব বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীতে নিষিদ্ধ, জান্নাতি পানীয়তে সে সব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে পারেনা। আল্লাহ্ যখন জান্নাতের পানীয় সম্পর্কে বর্ণনা করেন তখন তিনি আবার গুরুত্ব দেন যে পৃথিবীর পানীয়র ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য জান্নাতি পানীয় বহন করেনা:

তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে, ঝর্ণাধারা হতে। যা হবে তুষারশুভ্র সুস্বাদু পানকারীদের জন্য। তাতে (তাদের) মাথা ঘুরাবে না এবং তারা মাতালও হবে না। (সূর- ছফ্ফাহ্ ৪৫-৪৭)

স্রষ্টা কর্তৃক পানীয় বিষয়টি এত সুস্পষ্ট করা সত্ত্বেও কারো অসংগতির যুক্তি প্রদর্শন অবশ্যই সন্দেহজনক। কুরআানের একটি অলৌকিক ব্যাপার হলো - কোন জন অজ্ঞতা ও মতলব নিয়ে অগ্রসর হলে সে এর সরলতম বিষয় বুঝতেও অক্ষম হবে। আল্লাহ্ তাঁর এক আয়াতে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন:

আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ ঈমানদার হয় না। আর যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করেনা আল্লাহ্ তাদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন। (সূর-ইয়ূ:নুছ ১০০)

দ্বিতীয়ত, জান্নাতে যে পানীয় দেয়া হবে তা বুঝানোর জন্য সূর-মুহাম্মাদের ১৫ নং আয়াতে আরবী শব্দ 'হামর'(আরবী ভাষায় মদ ও সকল মাদকযুক্ত পানীয় বুঝায়) ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের আর সকল পংতি মালায় 'সরাব' (আরবী ভাষায় সকল পানীয় বুঝায়) শব্দটি বেহেশ্‌তের পানীয় বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু ইংরাজী অনুবাদে আরবী 'সেরেবে' শব্দের অর্থ (আরবীতে মাদক বা মাদকহীন পানীয় বুঝায়) ওয়াইন/মদ করা হয়েছে। কুরআনে এ শব্দটি যে কোন পানীয় বুঝাতে প্রয়োগ করা হয়েছে; একটি আয়াত দেখা যাক:

সেথায় তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেথায় তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়র (সরাব) আদেশ দিবে।(সূর- ছ্ব-দ্ব ৫১)

মদ বিষয়ে অরেকটি ভুল ব্যাখ্যা

সুর- নাহ্‌ল আয়াত ৬৭ এ বলা হয় " **আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক (যা হারাম হওয়ার পূর্বে) ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাকো, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।**"

সীমিত জ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করে যে এ আয়াত মদের প্রশংসা করে; আরও দাবি করে যে নিষিদ্ধ পানীয় পান প্রশংসিত হওয়া উচিৎ। শুরুতে যদি আপনি শুভদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে কুরআনের এ পংতি মালায় এ রকম কোন প্রশংসা নেই। প্রশংসা আছে 'খেজুর ও আঙ্গুর' এর যা মানুষকে সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি দেয়। পংতির প্রথম অংশে যে মাদকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা উল্লিখিত উপাদান থেকে পরিশাধনের মাধ্যমে লাভ করা হয় এবং তা নেশা ধরায় - কুরআনের বিভিন্ন অংশে এ বিষয়টিকে ক্ষতিকর ও ভুল আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর পরও যদি কেউ মনে করে যে এ পংতি মাদকতাকে প্রশংসা বা উৎসাহিত করে তাহলে বুঝতে হবে যে হয় লোকটি মতলববাজ না হয় তার বুঝার ও মন্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভুল আছে।

এ পংতি আমাদের দৃষ্টিকে একটি বিশেষ দিকে আকর্ষণ করে: বেঁচে থাকার জন্য স্রষ্টা কর্তৃক আমাদের যা কিছু দেয়া হয়, আমরা চাইলে তা ইতিবাচক বা উপকারী ভাবে অথবা অপব্যবহার বা ক্ষতিকর ভাবে ব্যবহার করতে পারি। তেমনিভাবে, অভিপ্রায় নির্ভরতার ভিত্তিতে, প্রাপ্ত আশীর্বাদকে ভালো বা মন্দ কাজে ব্যবহার করা যায়, আবার আইনী (হালাল) অথবা বেআইনী (হার-ম) কাজে ব্যবহার করা যায়। এ হলো পরীক্ষার স্থল, পৃথিবীর মৌলিক বিষয় - আঙ্গুর আর মদ বিতর্ক। পুষ্টিকর , স্বাস্থ্যসম্মত, প্রতিপালনকারী ও সুস্বাদু আঙ্গুরকে শোধন করে স্থায়ীভাবে নেতিবাচক প্রভাবশালী ও ক্ষতিকর চোলাই মদ তৈরী করা যায়। একই নীতি আল্লাহ্‌র দেয়া অন্যান্য নিয়ামত যেমন - সম্পদ, অর্থকড়ি, সৌন্দর্য, জ্ঞানবুদ্ধি, অফিস, পদ, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য হয়। এ সকল বিষয়কে ভালো পথে ব্যবহার করে স্রষ্টাকে খুশী করা যায় আবার মন্দ ভাবে ব্যবহার করে তাঁকে অখুশী করা যায়।

আল্লাহ্‌ও তাঁর দেয়া উপহারকে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রূপ দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর এক আয়াতে একই রূপ উৎকৃষ্ট বিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। আর যে কারণ ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে সে আল্লাহ্‌র আয়াত বুঝতে পারে। **'যারা কারণ বুঝে তাদের জন্য নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে। (সূরা-নাহ্‌ল:৬৭)'** - আয়াতটি বিষয়টির প্রতি আধিকতর আলোক সম্পাদ করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, যখন বিবেক জাগ্রত রেখে ও মনোযোগ দিয়ে আয়াত পড়া হবে তখন অদৌ পরস্পর বিরোধী দেখাবেনা। তবে অস্বীকারকারীরা আয়াতের অবধারিত বিষয়ের মধ্যেও পরস্পর বিরোধিতা খুঁজে থাকে।

"সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে উৎপাদিত শুকর খাওয়া"র পক্ষে যুক্তি

শুকরের নানা ধরনের ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য আছে যা অতীতে কুরআান যুগেও ছিল এবং বর্তমান যুগেও রয়েছ। প্রথমেই বলা যেতে পারে যে যত স্বাস্থ্যকর বা পরিষ্কার পরিবেশে শুকর বড় করা হোক না কেন এরা নিজ বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। নিজ মল খাওয়ায় ও জৈবিক গঠনগত কারণে রেচন পদ্ধতি দ্বারা এর রক্তে অনেক জীবানু নাশক তৈরী হয়। উপরন্তু, এর পরিপাক প্রণালী অন্য পশু বা মানুষের তুলনায় অধিক পরিমাণ বর্ধনশীল হরমোন তৈরী করে। প্রাকৃতিক ভাবে, এ সকল জীবানু নাশক ও বর্ধনশীল হরমোন রক্তের মধ্যে চলাচল কালে শুকরের মাংস পেশীতে পৌছে এবং সেথায় জমা হয়। উপরন্তু, শুকরের মাংসে অত্যধিক পরিমাণ কোলেস্টরেল ও লিপিড থাকে। ফলে, বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত যে শুকরের মাংসে থাকা অতিরিক্ত এ্যান্টিবডি, হরমোন, কোলেস্টরেল এবং লিপিড মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

শুকরের মাংস জনপ্রিয় এমন দেশ, যেমন - আমেরিকা ও জার্মানিতে আজকাল স্থূলতা সমস্যা ব্যাপক আকারে দেখা যায়। যে কারো খাদ্য তালিকায় শুকরের মাংসের অন্তর্ভুক্তি প্রথমত ব্যাপক ভাবে হরমোন বৃদ্ধি করবে যা তার ওজন বাড়াবে; দ্বিতীয়ত তার শরীর বিকৃত আকার ধারণ করতে থাকবে।

শুকরের মাংসের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো এতে থাকা বিশেষ ধরনের কৃমি ট্রিসিনা রোগ সৃষ্টি করে। শরীরে প্রবেশের পর বিশেষ ধরনের কৃমি হৃৎপিন্ডের মাংসপেশী আক্রান্ত করে এবং প্রাণনাশক ঝুঁকি তৈরী করে। সাম্প্রতিক কালে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা এ পরজীবী কৃমির বিষয়টি জানা যাচেছ; তার মানে সুদূর অতীতে ও মানুষ এ ঝুঁকির মধ্যেই ছিল। কিন্তু তারা তা জানত না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইসলামে শুকর ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার যুক্তি গুলো পরিষ্কার। ইসলামে শুকর খাওয়ার বিরুদ্ধে সুনিদৃষ্ট সুস্পষ্ট ও গভীর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; এ পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া এসকল ঝুঁকিপূর্ণ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়।

যাহোক, একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় বিষয় হলো - কোন কিছু নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য তা মানুষের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর হওয়া আবশ্যক নয়। এ দিকটি অনেকে খেয়াল করেনা বলে মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কোন কোন সময় দূরবর্তী মতলবে একই বিষয়কে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়ে থাকে। তাই বলতে হচ্ছে, অজ্ঞ লোকেরা তখন বলে " এটা বা ওটা কুরআনে নিষেধ করার কারণ কি? এতে তো কোন দোষ নেই।" কুরআনের নির্দেশনের উদ্দেশ্য বুঝার লক্ষ্যে প্রয়োগকৃত অচিন্তা ও অজ্ঞতার ফল স্বরূপ এ ধরনের কথার সৃষ্টি হয়। অজ্ঞ লোকেরা কোন সময় অবিশ্বাস্য রকম সরু ও সীমিত লেন্স দিয়ে অভিমত পর্যবেক্ষণ করে; ফলে তাদের পক্ষে বৃহৎ প্রেক্ষাপটের পিছনের কারণ ও যুক্তি অনুভব করা সম্ভব হয়না।

আল্লাহ্ মালিক বিভিন্ন কারণে যে কোন জিনিস নিষেধ করতে পারেন। আবার ক্ষতিকর নয় এমন জিনিসও তিনি প্রকৃত আল্লাহ্ভীতি, আল্লাহ্ প্রেম ও আল্লাহ্ আনুগত্য এবং মুনাফিকী পরীক্ষা করা ও প্রকাশের জন্য নিষিদ্ধ করতে পারেন। উপরন্তু, শাস্তি ও সতর্কতা সরূপ অথবা সাদামাটা ভাবে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য কিম্বা মানুষের কৃতজ্ঞতা পরীক্ষার জন্য তিনি কোন জিনিস নিষিদ্ধ করতে পারেন।

তিনি তাঁর নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গকৃত প্রাণী খেতে আল্ কুরআনে নিষেধ করেন।

তিনি তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত (প্রবাহিত রক্ত) শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত শুধু তা হারাম করেছেন; কিন্তু যে নিরুপায়; (হারামের প্রতি) ইচ্ছুক নয় এবং তা ভক্ষণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূর- বাক্-র-হ্ ১৭৩)

এটা পরিষ্কার যে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গিকৃত নয় এমন পশুর গোশ্ত আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। উল্লেখ্য, একই মাঠে ঘাস খাচ্ছে এমন দু'টি ষাঁড়ের একটিকে আল্লাহ্র নামে জবেহ্ বা উৎসর্গ করা হলে তা খাওয়া আইন সম্মত(হালাল) হবে; বিপরীতক্রমে, অন্যটিকে যদি আল্লাহ্

ব্যাতীত অন্য কোন নামে জবেহ্ বা উৎসর্গ করা হয় তবে তা খাওয়া বেআইনী (হার-ম) হবে। হতে পারে যে এ আদেশ দ্বারা স্রষ্টা মানুষকে পরীক্ষা করেন।

উদাহরণ সরূপ, অতীতে ইয়াহূদিদের উপর 'শনিবারে কাজ না করার ' নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল বলে কুরআানে উল্লেখ আছে:

আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস কর, (স্মরণ কর) যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল- শনিবারের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসতো; কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করতো না সেসব দিন ওগুলো তাদের কাছে আসতো না; এভাবে আমি সত্য ত্যাগের কারণে তাদেরকে পরীক্ষা করছিলাম। (সূর- য়:রা-ফ ১৬৩)

অতীতে ইয়াহূদিদের কাজ করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল পরবর্তীতে তা মুসলিমদেরকে দেয়া হয়নি। এ ঘটনা এই বুঝায় যে মাছ গুলো ঝাঁক বেধে ঐ দিন শহর অভিমুখে যাত্রা করতো তাতে কোন সামাজিক শংকা বা ঝুঁকির কারণ ছিল না; বরং ইয়াহূদিদের পরীক্ষা করাই স্রষ্টার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ আয়াতে আরো বলা হয়, তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিল এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল। এ নিষেধাজ্ঞার ঘটনা সে জাতির ঈমানের দুর্বলতার ও আল্লাহ্ ভীতির অভাব দেখানোর মাধ্যম হয়েছিল।

একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসী নির্ণয়ের জন্য কুরআানে অনুরূপ আরো নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়:

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন কতক শিকারের দ্বারা, যেগুলো তোমাদের হাত ও তোমাদের বল্লমের সীমানায়; এ উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করবেন যেন তিনি জেনে নিতে পারেন- কে তাঁকে না দেখে ভয় করে? সুতরাং যে ব্যক্তি এরপরও সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকারকে হত্যা করো না; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক ওকে

হত্যা করবে তার উপর তখন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) হত্যাকৃত জানোয়ারের সমতুল্য, যার (আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দেবে; যে জন্তু হত্যা করেছে তার সমান পর্যায়ের একটি কুরবানীর জন্তু সে কা'বায় পৌঁছে দেবে অথবা কয়েকজন মিসকীন খাওয়ানোর কাফফারা দেবে, অথবা এর সমপরিমাণ রোযা রাখবে, যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে; অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কর্মই করবে; আল্লাহ্ সে ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন; আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তোমাদের জন্যে সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের উপভোগের জন্যে, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক; আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (সূর-মায়িঃদাহ্ ৯৪-৯৭)

এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়াত বা পংতি মালায় স্পষ্ট বলা হয়েছে "...আল্লাহ্ যাতে জানতে পারেন যে কারা তাঁকে নাদেখে ভয় করে।"

বিভিন্ন জাতিকে পরীক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দ ব্যবহার ও বিকৃত আচরণ করলে শাস্তি দেয়া এবং আনুশোচনা করতে ও সঠিক পথে ফিরে যেতে স্মরণ করানো। অতীতে ইয়াহুদিদের প্রতি কিছু নিষেধাজ্ঞার উদাহরণ:

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্বপ্রকার নখ বিশিষ্ট জীব নিষিদ্ধ করেছিলাম; আর গরু ও ছাগল হতে তাদের জন্যে উভয়ের চর্বি নিষিদ্ধ করেছিলাম; কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি-ভুঁড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এ নিষিদ্ধের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিশ্চয় আমি সত্যবাদী।
(সূর- আনয়ঃাম ১৪৬)

এবার, আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আল্লাহ্ যখন কোন কিছুকে বেআইনী বলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তখন তাতে তাঁর গভীর

প্রজ্ঞাপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে মর্মে ধরে নিতে হবে। আর আমরা যদি প্রতিটি নিষেধাজ্ঞার পিছনে এর ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর দিক খুঁজি তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের মধ্যে কুরআনের যথাযথ জ্ঞান ও বুঝের অভাব রয়েছে।

প্রসঙ্গত, শুকরের মাংস নিষিদ্ধ করার অধিকতর কারণ রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সবসময় শুকরের মাংস মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ছিল। আধুনিক চিকিৎসা সামগ্রীও শারীরিক পরীক্ষার দ্বারা বর্তমান কালে শুকরের মাংসের ঝুঁকি আবিষ্কারের ১৪০০ বছর পূর্বে যখন মানুষ রোগজীবানু, ব্যাক্টেরিয়া, ট্রাইসিনা, হরমোন বা এন্টিবডি সম্পর্কে কিছু জানতোনা তখন আসমানী গ্রন্থ কুরআনে শুকরের মাংস খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা একটি অলৌকিক বিষয় বৈকি!

আজ জানা যায় যে যতই দেখাশুনা ও সতর্কতা অবলম্বন করে শুকরের মাংস উৎপাদন করা হোক না কেন, শারীরিক গঠনগত ভাবেই তা মানুষের ভোগের অনুপোযোগী, এটা এমন ধরনের মাংস যা মানুষের শরীরে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে, এর উৎপাদন স্বল্পখরচের বিধায় সারা পৃথিবীতে শুকর জনপ্রিয়। এ লোভনীয় বিষয়টি আমরা অতীতেও লক্ষ্য করি; ইয়াহুদিদের শনিবারের নিষেধাজ্ঞার সময়ে মৎস্য প্রবাহের সাথে এ ঘটনার সাযুয্যতা লক্ষ্যণীয়। এছাড়া, মজাদার মাংসের অনেক উৎস যেমন - কচি ভেঁড়া, বড় ভেড়া, কচি মুরগী,মোরগ-মুরগী, গরু-ছাগল, অসংখ্য প্রজাতির পাক-পাখালী, পশুসহ খাওয়ার আরো অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও স্রষ্টার নিষিদ্ধ শুকর খাওয়ার লোভ করা উদ্দেশ্যমূলক গণ্য করতে হবে।

যেহেতু কুরআন শেষ বিচারদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, সেহেতু কুরআনে উল্লিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া, যে কোন কায়দায় শুকর খাওয়া শেষদিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে। যদি একশত বছর পরে যেকোন ভাবে শুকরের মাংস পরিশোধন করা সম্ভব হয় তবুও বিশ্বাসীর জন্য শুকর নাখাওয়া ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত থাকবে। তেমনি ভাবে বোধহীন বিরোধিতাকারীদের জন্যও এটি একটি পরীক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে।

কুরআনে বর্ণিত সত্য ঘটনাকে পৌরাণিক কাহিনী বলা

কুরআন প্রকাশ পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো নানা উদাহরণ ও উপমার দ্বারা এর বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করা। কখনো পূর্বের নবী/বার্তবহর জীবনের ঘটনা বা কখনো কুরআন প্রকাশের আগের ঘটনা এ উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, এ ধরনের সত্য ঘটনা মানুষের জন্য অনেক সতর্কীকরণ, উদাহরণ, নিদর্শন ও বার্তা বহন করে।

কুরআনের পবিত্র প্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম এমন লোকদের কথাও কুরআন বয়ে আনে :

যখন আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে তাদেরকে শুনানো হয় তখন তারা বলে, 'আমরা পূর্বেই শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও অনুরূপ বলতে পারি। নিঃসন্দেহে এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।' (সূরা- আংফাল ৩১)

যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন? ' উত্তরে তারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা।' (সূরা- নাহ্‌ল ২৪)

এসব সত্য ঘটনাকে অজ্ঞানীরা রূপকথা ও লোক কাহিনী মনে করে; যদিও প্রকৃত বিশ্বসীদের নিকট এগুলো জ্ঞানগর্ভ তথ্য রূপে প্রতিভাত হয়। অতীতের র-সূল ও নানা সম্প্রদায়ের জীবনের নিদর্শন টেনে বা উদাহরণ দিয়ে স্রষ্টা প্রতিটি সম্ভাব্য ঘটনা ও আইনের ব্যাখ্যা করেন।

অবশ্য, কুরআনের ঘটনা বা উদাহরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন নয়। এ গুলো অসংখ্য পবিত্র উদ্দেশ্য বহন করে। আমরা এর কিছু তালিকা এ ভাবে তৈরী করতে পারি:

– মহাবিশ্ব সৃষ্টির কাল থেকে বিদ্যমান স্রষ্টার আইন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে যে শাসন করে আসছে তা দেখানো।

– সর্বকালের বিশ্বাসীগণ যেকোন পরিণাম, পরীক্ষা, বা দুর্ভোগে পতিত হলে কি রকম আচরণ ও প্রতিক্রিয়া করবে; কি রকম সাহসিকতা ও বিবেক প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্‌র প্রতি কি রকম আচরণ ও আদব-কায়দা প্রকাশ

করবে তা ব্যাখ্যা করা ও অনুরূপভাবে তৈরী করা; এক কথায় বিশ্বাসীদের প্রত্যেক বিষয়ে সঠিক পথ দেখানো।
– প্রকৃত বিশ্বাসীর মনের প্রবল উৎসাহ বৃদ্ধি করা।
– অবাধ্যদের সঠিক পথে আহ্বান করা আর যারা আহ্বানে সাড়া দেয়না তাদের কি ধরনের পরিণতি হবে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া।
– এ বিশ্বে ও পরবর্তী বিশ্বে কি আনন্দদায়ক পরিণতি আপেক্ষ করছে সে সম্পর্কে কুরআানের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেয়া।

বাস্তবে, যারা এ বিষয়গুলো বুঝার বোধশক্তি রাখেনা তারা ধরে নেবে যে কুরআান এক গল্পের বই; সে কুরআানের ঘটনার মধ্যকার লুক্কায়িত প্রজ্ঞার নাগাল পাবেনা। এ সকল সিদ্ধান্তকারী ও অসচেতন মানুষেরা যে কোন ব্যাখ্যা বা উপদেশের প্রতি বধির থাকে - যেমন কুরআান বলে: **তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা মনোযোগ সহকারে আমাদের কথা শুনে অথচ বুঝা থেকে নিজদের বিরত রাখে; তাদের কানে বধিরতা আছে। তারা যদিও সকল নিদর্শন দেখতে পায় তবুও বিশ্বাস স্থাপন করে না, কাজেই যখন তারা তোমার নিকট আসে, আপত্তি তোলে, তখন এ অবিশ্বাসীরা বলে, 'এটা প্রাচীনকালের লোকদের কিস্‌সা- কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।' (আনয়:াম ২৫)**

এরকম লোকেরা তাদের কর্যক্রম দ্বারা ইসলাম বা কুরআানের কোন ক্ষতি করতে পারেনা। এরা নিজেদের কি পরিমাণ ক্ষতি করে তা বুঝেনা; তবু তারা কুরআানের ক্ষতি করার ও অন্যদের কে পিঠটান দেয়ানোর যতই চেষ্টা করুকনা কেন কোন ফয়দা হবেনা। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত আয়াতের ধারাবাহিকতায় এ বিষয় তুলে ধরা হয়:
তারা তা থেকে অন্যদের বিরত রাখে, নিজেরাও দূরে দূরে থাকে। বস্তুতঃ তারা শুধুমাত্র নিজেদেরকে ধ্বংস করছে অথছ তারা অনুভব করছে না... (আনয়:াম ২৬)

সবশেষে, যখন তারা নিজ ভুল পথ অনুধাবন করবে তখন সে বুঝ আর কোন কাজে আসবেনা; কারণ, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে সংশোধন বা মেরামতের আর সুযোগ নেই:

যখন তাদেরকে জাহান্নামে দাঁড় করানো হবে তখনকার অবস্থা যদি দেখতে, তারা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!' (আনয়:াম ২৭)

কুরআানকে অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের নকল বা অনুকরণ মনে করা

কুরআান হলো একমাত্র সেই আসমানী গ্রন্থ যা আল্লাহ্ মানব জাতির সবার উদ্দেশ্যে সতর্ককারী তথা পথপ্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছেন। কুরআানের পূর্বে যে সকল পবিত্র গ্রন্থ প্রেরিত হয়েছে মানবজাতি সেগুলো পরিবর্তন বা বিকৃত করেছে। আল্লাহ্ কুরআানকে সুরক্ষা করেছেন। এ সত্য **সূর- হিজর** এর ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।"**আমরা স্মরণিকা প্রেরণ করেছি এবং আমরা একে সংরক্ষণ করবো।**"

অজ্ঞদের কর্তৃক প্রচারিত আরেকটি বিকৃত দাবি হলো র-সূল মুহ:াম্মাদ(ছ-) বাইবেল দ্বারা (তৌরতও ইঞ্জিল) উদ্বুদ্ধ হয়ে কুরআান রচনা করেছেন। বাইবেল ও কুরআানের মধ্যে আপত কিছুটা মিল দেখার কারণে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন এ দাবির উদ্ভব ঘটেছে। তবে এ ধরনের মিল থাকা স্বাভাবিক; কেননা এতে শেষ পর্যন্ত (যদি আমরা তৌরত ও ইঞ্জিল থেকে পরিবর্তিত অংশ গুলো বাদ দেই) স্রষ্টার কথা এবং একই ধর্মীয় কথা আছে। মূল বিষয়, যেমন - আল্লাহ্র অস্তিত্ব, একত্ব, স্বভাব গুণ, পরকালে বিশ্বাস; বিশ্বসীর, মুনাফিকের, অস্বীকারকারীর বৈশিষ্ট্য; আগেকার জাতিদের জীবন, পথনির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা ও নৈতিক মূল্যবোধ, সবকিছু শাশ্বত ও সব সময় অপরিবর্তিত থাকবে। অতএব, পূর্ববর্তী পবিত্র গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রসংগের সাথে কুরআানের মিল বা সামঞ্জস্য দেখা গেলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বাস্তবিক পক্ষে, ইসলামকে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম বলে কুরআান দাবী করেনা। বরং, উল্লিখিত আসমানী গ্রন্থের সাথে কুরআানে মিল স্বীকার করে:

পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে অবশ্যই এর (কুরআন) উল্লেখ আছে। বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এর কথা অবগত আছে- এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? (শুয়ার- ১৯৬-১৯৭)
নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল, আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে আদেশ করেছিলাম, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর... । (নিসাা ১৩১)

কুরআান অতিরিক্ত যে কাজ করছে তা হলো তৌরত ও ইঞ্জিলের অপরিবর্তিত বা মূল বিষয় প্রতিপাদন বা সত্যয়নঃ
আর আমি এ কিতাব কে (হে মুহাম্মাদ) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা হক্বের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐসব কিতাবের সংরক্ষকও; সুতারাং তুমি তাদের পারস্পারিক বিষয়ে আল্লাহ্র অবতারিত এ কিতাব বিচার অনুযায়ী মীমাংসা করো এবং যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছো তা থেকে বিরত হয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, তোমাদের প্রত্যেক (সম্প্রদায়) এর জন্যে আমি নির্দিষ্ট শরীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি; .... (মায়িঃদাহ্ ৪৮)

পূর্ববর্তী পবিত্র গ্রন্থ গুলো সত্যায়ন করা কুরআনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিছু নয়, কেননা ইতঃপূর্বে নবী ইসা(য়ঃা)র প্রতি নাযিলকৃত ইঞ্জিল পূর্ব নবী মুসা(য়ঃা)র প্রতি নাযিলকৃত তৌরতকে সত্যায়ন করেছে। এ সত্য কুরআান বিবৃত করেছেঃ
আর আমি তাদের পর মারইয়াম পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছিলাম, সে তার পূর্ববর্তী কিতাব বা তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিল এবং আমি তাকে ইনজীল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত এবং আলো ছিল আর এটা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ ছিল। (মায়িঃদাহ্ ৪৬)

এ হলো স্রষ্টার আইন যা কুরআানের ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রজোয্য। অন্যান্য আসমানী কিতাবে কিছু বিষয় বলা হয়েছে যা কুরআানেও উল্লেখ আছে। নবী ইব্র-হীম(য়ঃা) থেকে হ:াজ্জ(তীর্থ যাত্রা) আরম্ভ [সূর- হ:াজ্জ ২৬-২৭],আমাদের নবীর পূর্বে দৈনিক ফরয নামায ও দান খয়রত [সূর-

অম্বিয়া ৭২-৭৩] এবং সকল নবীর থেকে ভালো ব্যবহার [সূর- মু'মিনুন ৫১] প্রত্যাশার মতো সাধারণ বিষয় কুরআনে প্রতিফলিত হয়েছে:

"আর আমি ইব্রাহীমের জন্য কাবা গৃহের স্থান নির্ধারন করে দিয়েছিলাম (বলেছিলাম), আমার সাথে কোন শরীক স্থির করো না এবং যারা কিয়াম করে, রুকু করে ও সিজদা করে আর তাওয়াফকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রেখো। মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমাদের কাছে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে করে আসবে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।" (সূর- হ:জ্জ ২৬-২৭)

এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত পৌত্ররূপে ইয়াকুবকে আর প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। আর আমি তাদেরকে করে দিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করতো। তাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে, তারা আমারই ইবাদত করতো। (আম্বিয়:া ৭২-৭৩)

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত। (মু:মিনুন ৫১)

এবার আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কুরআন ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থে একই রূপ বিশ্বাস আছে যা শুধু প্রাকৃতিক নয় যৌক্তিকও বটে। সুতরাং, এ সব সামঞ্জস্য প্রমাণ করেনা যে আমাদের নবী(স্ব-) কুরআন লিখেছেন। বিপরীতক্রমে, এ সত্য প্রকাশিত হচ্ছে যে পত্যেকটি আসমানী ধর্মগ্রন্থ এক উৎস আল্লাহ্ থেকে এসেছে। কুরআন এ বাস্তবতাকে বিবৃত করেছে এবং কার্যকারণ ও যুক্তি দিয়ে বিবৃতি নিশ্চিত করেছে।

আল্লাহ্ কুরআনের পংতিমালায় বলেন যে তাঁর কর্তৃক এ গ্রন্থ প্রেরিত হয়েছে; যারা এ সত্য গ্রহণ করে না তাদের অবস্থা কি রকম হবে তাও তিনি বলেন:

আর এ কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এ তো পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী

এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের তফসীল বর্ণনাকারী, এ কুরআন বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল হওয়া ব্যতীত কারো থেকে হয়নি। বরং এর পূর্বে যে সব কিতাব এসেছিলো তা সত্যায়নকারী এবং এ কিতাবের বিশদ ব্যখ্যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের তরফ থেকে। তারা কি বলে, 'এটা তার (নবীর) স্বরচিত?' বল, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাকে যাকে নিতে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' না, তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে যা তাদের বোধগম্য নয়। তাদের পূর্বে বিগতরা অনুরূপভাবে সত্য অস্বীকার করেছিলো। দেখো, সে অত্যাচারীদের পরিণাম! (ইয়ুঃনুছ ৩৭-৩৯)

উপরন্তু, এ বিষয়টির আরো একটি ক্ষেত্র রয়েছ। নবী মুহঃাম্মাদ (ছ-) এমন কেউ নন যিনি তাঁর জীবদ্দশায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তৌরত ও ইঞ্জিল নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর স্বগোত্রীয় সহচরগণ গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছেন যে তিনি বাস্তবে লেখা পড়া করেননি কিংবা এসব পুস্তকের উপর গবেষণা করেননি। আর এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিলনা। অধিকন্তু, নবীর এ বৈশিষ্ট্য অবিশ্বাসীদের নিকট সুবিদিত ছিলো যা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে কুরআানে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

তুমি এর পূর্বে অন্য কোন কিতাব পাঠ করনি এবং কোন দিন স্বহস্তে কিতাব লিখনি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে। (সূর- আঙ্কাবুতঃ ৪৮)

যে ব্যক্তির পূর্বেকার আসমানী কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান নেই এবং ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নন তার ক্ষেত্রে 'উম্মি' শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে; আল কুরআানে নবী মুহঃাম্মাদের (ছ-) এ বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য তাঁর ক্ষেত্রে 'উম্মি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছেঃ

যারা অনুসরণ করে চলে সেই উম্মি রাসূল (ছ-) কে, যাঁর কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পায় ... (সূর- য়াঃর-ফ ১৫৭)

যারা খৃষ্টান বা ইয়াহুদি নন তাদের প্রসংগেও 'উম্মি' শব্দটি ব্যবহার করেঃ যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে তবে তুমি বল, 'আমি ও

আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি।' যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে এবং যাদেরকে প্রদান করা হয়নি (উম্মি) তাদেরকে বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হয়েছো?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে সরল পথ পাবে। আর যদি ফিরে যায়, তবে তোমার দায়িত্ব তো শুধু প্রচার করা মাত্র। আল্লাহ্ বান্দাদের লক্ষ্য করেন। (য়ি:মর-ন: ২০)

আমরা এ আয়াত থেকে অনুমান করতে পারি যে যাদের নিকট পুস্তক প্রেরণ করা হয়নি তাদের বুঝানোর জন্য 'উম্মি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে প্রচলিত অর্থে 'নিরক্ষর' বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। অতিরিক্ত অর্থে অর্থাৎ অন্য ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব বুঝাতেও 'নিরক্ষর' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বৈপরীত্য ও পার্থক্য

আমরা এ পর্যন্ত কুরআান ও অন্যান্য পরিবর্তিত গ্রন্থের মধ্যে পরিদৃষ্ট সামঞ্জস্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছি। তবে যথেষ্ট মনোযোগ দিলে উভয়ের মধ্যে অধিকতর বৈপরীত্য ও পার্থক্য উপলব্দি করা যাবে। বিদ্যমান সাদৃশ্যের বাইরের অতিরিক্ত বিষয় হলো যে অন্যান্য অপার্থিব বইয়ের পরিবর্তিত অংশের সাথে কুরআানের মিল নাহওয়া; এছাড়া পরিবর্তিত বা অমিলের অংশ কুরআান যেভাবে সংশোন করেছে তা প্রমাণ করে যে কুরআান শাব্দিক অর্থেই এক পবিত্র গ্রন্থ।

যেহেতু পূর্বের পবিত্র পুস্তকসমূহ লোকদের কর্তৃক ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়েছ, সেহেতু এসব থেকে স্বর্গীয় সুসমাচার ব্যাপক ভাবে হারিয়ে গেছে; তাই এ সব গ্রন্থে অনেক পরস্পর বিরোধী বরাত ও যুক্তি চোখে পড়ে, ফলে এ সমস্ত বক্তব্য কখনো কখনো কুরআান বিরোধী হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ সকল পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনা কুরআানে উল্লিখিত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়।

এ সমস্ত গ্রন্থ বিষয়বস্তুতে, যুক্তিতে, পদ্ধতিতে ও বিন্যাসে পরিবর্তিত হয়েছে; তাই এরা পবিত্র পুস্তক না হয়ে ধুম্রময় ধর্মীয় ইতিহাসে পরিণত

হয়েছে। উদাহরণসরূপ, তৌরতের প্রথম পুস্তক - জেনেসিস, সৃষ্টির শুরু থেকে নবী যোশেপ এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসরাইল জাতির কেচ্ছা বর্ণনা করে। তৌরতের অন্যান্য পুস্তকেও এরকম ইতিহাস বলা পদ্ধতির প্রবাল্য লক্ষণীয়।

একই ভাবে, ইঞ্জিলের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত চার অধ্যায় (ম্যাথিউ, মার্ক, লুক ও জন্) নবী ইসা (য়:া)র জীবনীকে প্রধান প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ সব অধ্যায়ের মুখ্য বিষয় হলো ইসা (য়:া) এর জীবনী, কথা ও কাজ।

এর বিপরীতে, পদ্ধতিগত দিক থেকে কুরআান ভিন্ন প্রকৃতির। কুরআান প্রারম্ভিক সূর- ফাতিহ:াহ্ দ্বারা ধর্মের প্রতি প্রকাশ্য আহ্বানের মাধ্যমে শুরু হয়। সার্বিক বর্ণনায়, কুরআানের মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘোষণা ও আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যে মুর্তিপূজা থেকে বিশ্বাসীদেরকে দূরে থাকার আদেশ দান। আজকাল, তৌরতের পরিবর্তিত বর্ণনায় অনেক অসামঞ্জস্য ও স্রষ্টার প্রতি আরোপিত মানব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; উদাহরণ - নবী নুহ্র কাহিনী, যেখানে, আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য নয় এমন সব কষ্টকল্পিত অর্থহীন বিষয় বলা হয়েছে। মানুষের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত এমন ধরনের অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন - ক্লান্ত অনুভব করা, অনুতপ্ত হওয়া এরকম আরো গুনাগুণ স্রষ্টার প্রতি আরোপ করা হয়েছে। পুনশ্চ, তৌরত স্রষ্টাকে মানুষের আদলে চিত্রায়িত করেছে; যেমন - তিনি মানুষের মতো হাঁটেন, যুদ্ধ করেন, রাগান্বিত হন ইত্যাদি ; অর্থাৎ এসব তথ্য বলে যে তাঁকে মারত্মকভাবে অপবাদ দেয়া হয়েছে।

এ কারণে এরূপ অপবাদ ও ইয়াহূদিদের দ্বারা মিথ্যা আরোপ করা সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআানে সতর্ক করেছেন। এ ছাড়া দেখা যায়, স্রষ্টাকে কখনো কৃপণ আখ্যায়িত করা হয়েছে: **ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ।' তাদেরই হাত রুদ্ধ এবং তাদের এ উক্তির দরুণ তারা অভিশপ্ত। না! তাঁর উভয় হাত প্রসারিত এবং তিনি যত ইচ্ছা দান করেন;.. (সূর-মায়ি:দাহ্: ৬৪)**

সর্বোপরি উল্লেখ্য, কুরআান তৌরত থেকে আরেক কারণে আলাদা; তা হলো তৌরত একটি জাতি সম্পর্কে বলে, অন্যদিকে কুরআান সকল জাতি ও সভ্যতা সম্পর্কে বলে, জাতিসমূহের উত্থান পতনের কথা বলে এবং যারা এ সব আয়াত পেয়েছে তাদের দয়িত্বের কথা বলে। এ বৈশিষ্ট্য কুরআানকে অনন্য ও বিশ্বজনীন করেছে। যেহেতু অন্যান্য পুস্তক মানুষ দ্বারা যুগেযুগে পরিবর্তিত হয়েছে সেহেতু এদের মৌলিকত্ব হারিয়েছে; ফলে কোন অভিনবত্ব নেই। ইঞ্জিলে খৃষ্টবাদের কিছু মূলনীতি উল্লেখ আছে; তাই বলা হয় যে এ উৎস থেকে কুরআান সৃষ্টি; তবে কুরআান এসব দাবী প্রত্যাখ্যান করে। খৃষ্টানগণ মনে করে যে নবী ইসা (য়:া) স্রষ্টার সন্তান; কিন্তু কুরআান বলে যে এ দাবি দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়:

তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে ও পর্বত সমূহ চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভনীয় নয়। আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না...
(সূর- মারিয়াম ৮৮-৯৩)

এরকম আরো একটি দাবী হলো ইয়াহ্‌দিদের কর্তৃক ইসা (য়:া)কে ক্রুশ বিদ্ধ করা যা কুরআান সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কুরআান বলে যে তাঁর মতো দেখতে এমন একজনের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে; আরো বলে যে ইসা (য়:া)কে সৃষ্টিকর্তা নিজের নিকট তুলে নেন।

উপসংহারে বলা যায়, আমরা যদি সাধারণ তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে - কুরআান যে গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ দেয় সে সত্য নির্দেশ হলো মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র একাত্ববাদের দিকে আহ্বান করা, যে তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, আর তাঁর প্রতি আরোপিত সকল নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি পবিত্র। এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কুরআানের ঘটনায়, উপাত্তে ও আয়াতে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। তেমনি ভাবে কুরআানের প্রতি ঘটনা পথনির্দেশ, সতর্কীকরণও তথ্য বহন করে।

আর এসব কিছু প্রমাণ করে যে কুরআান এক অলৌকিক প্রকাশনা।

কুরআান প্রাচীন সভ্যতা থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য আনয়ন করেছে মর্মে প্রচলিত ভুল ধারণা

কতক মানষ কর্তৃক কুরআান সম্পর্কে উত্থাপিত আরেকটি অযৌক্তিক দাবি সম্পর্কে বলবো। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কুরআান সমসাময়িক কালে অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে অগ্রীম জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছে। অথচ এ সত্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে বা কুরআানের অলৌকিত্ব ঢাকতে গিয়ে কেউ কেউ বলে যে র-সূল মুহ:াম্মাদ(ছ-) সে সময়ের পূর্বের অগ্রসর সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন।

এ দাবি অনুযায়ী বলা যায় যে মুহ:াম্মাদ (ছ-) নভবিদ্যা, ভ্রূণ বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন সভ্যতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন বলা হয়, তিনি নভবিদ্যা বিষয়ে সুমিরিয়দের থেকে আর চিকিৎসা বিষয়ে পেপিরাসে লিখিত মিশরীয়দের জ্ঞান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কুরআানভুক্ত করেছিলেন।

এ সমস্ত অনুমানের অসত্যতা বিভিন্ন কোণ থেকে দৃশ্যমান হয়। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে র-সূল মুহ:াম্মাদ(ছ-) তাঁর জীবদ্দশায় কোন সময়ে এ ধরনের গবেষণা করেননি। যতদূর জানা যায় যে এ রকম রূপকথা কেউ কখনো বলেও নি। তাছাড়া আরও বলতে হয় যে নবীর এ সব সভ্যতার ভাষা সম্মন্ধে কোন জ্ঞান ছিলনা।

পুনশ্চ, সে যুগে এ রকম গবেষণা করতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এটা নিশ্চিত যে ৭ম শতকের আরবে আমাদের সময়ের গবেষণা উপকরণ যেমন লাইব্রেরী, ছাপাখানা, বই-সংগ্রহ বা ইন্টারনেট ছিলোনা। এমনকি বর্তমান যুগের প্রযুক্তি দিয়েও ভ্রূণবিদ্যার উপর প্রাচীন মিশরীয়দের উপাত্ত আবিষ্কার এত সহজ নয়। এ সভ্যতা ৫০০০(পাঁচ হাজার) বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সীমিত সংখ্যক লিখিত উৎস আমাদের সময় পর্যন্ত টিকে আছে। অধিকন্তু বলা যায় যে এর সবটুকু এ

পর্যন্ত অনুদিত হয়নি। আরো বলা যায় যে এ সমস্ত অনুবাদ বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে সে সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে। সর্বোপরি, সংক্ষেপে বলতে গেলে, বলতে হয়, এ ধরনের গবেষণা করা আমাদের সময়ের সহজতর পরিস্থিতিতেও অনেক কঠিন।

উপরন্তু , এ রকম ভাবার কোন কারণ নেই যে অতীত সভ্যতা থেকে আমরা যেসব তথ্য-উপাত্ত পাবো তা সর্বাংশে সঠিক ও সুষম হবে। ঐ সব সভ্যতায় ভুল তথ্য, অলৌকিকত্ব, বিকৃত বিশ্বাস অহরহ দেখা যেত। অজ্ঞানীগণের দাবি অনুযায়ী কুরআান অতীতের সভ্যতা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করলে এ সকল ভুল ও অষম দিকগুলো কুরআানে পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হল, কুরআান এ সমস্ত দিক থেকে একেবারেই আলাদা। এছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে এর বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিটি আয়াত ১০০%(শতকরা শতভাগ) সঠিক। এ আয়াতে এ সত্যের উপর সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছঃ

"তারা কেন কুরআান নিয়ে গবেষণা করেনা? ওটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসতো তবে তারা ওতে বহু অসঙ্গতি পেতো।"
(সূর- নিসাা ৮২)

কাজেই মুহাম্মাদ (ছ-) বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ আয়াতের রসদ অন্যান্য সভ্যতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন - এ দাবি অপরাপর দাবিগুলোর মতো ভিত্তিহীন। এ ধরনের দাবি যারা তোলে তাদেরকে কি বলে জবাব দিতে হবে তা নিম্নলিখিত পংতি মালায় বলা হয়েছেঃ

কাফিররা বলে, 'এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে; এরূপে তারা যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।' তারা বলে, 'এগুলো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়।' বলঃ 'এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূর- ফুরক্ব-ন ৪-৬)

কেবলমাত্র আরবদের উদ্দেশ্যে কুরআান প্রকাশিত হয়েছে এমন ধারণা

অস্বীকারকারীগণ কুরআান থেকে অন্যদের দূরে সরানোর উদ্দেশ্যে বলে যে কুরআান কেবলমাত্র আরবদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে। সতরাং কেবলমাত্র আরবরা কুরআান অনুসরণ করবে। যে কেউ একবার কুরআান পড়লেই বুঝতে পারবে যে তাদের এ দাবি কত ভিত্তিহীন ও হাস্যকর।

কুরআানের অনেক পংতিমালা জোর দিয়ে বলে যে নবী মুহ:াম্মাদ (ছ-) এক জন বার্তাবহ যাকে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সবাই কুরআানের আদেশ পালনের দয়িত্ব প্রাপ্ত। আমরা এ সংক্রান্ত কুরআানের কিছু পংতি তুলে ধরব যা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করবে:

আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা। (সূর- সাবা ২৮)

বল, 'হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌম অধিপতি আল্লাহ্‌র রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি।' (সূর- য়:ার-ফ ১৫৮)

আগুছালো মানুষজনকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অস্বীকারকারীরা যে অনুরূপ কথা বলে থাকে তা কুরআানের নিম্নলিখিত পংতিমালা জানিয়ে দেয়: **আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি যাতে করে তারা তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূর- ইব্র-হীম ৪)**

উল্লিখিত পংতিমালা স্বচ্ছ কাঁচের মতো পরিষ্কার। যে জাতির উদ্দেশ্যে নবীগণ প্রেরিত হন সে জাতির ভাষায় তাঁরা কথা বলেন। যুগে যুগে এরকম ঘটেছে। নিজ জাতির ভাষায় কথা বলেন বলে চারদিকের সমরূপ লোকদেরকে আল্লাহ্‌র প্রকাশন সম্পর্কে সঠিকভাবে বা পরিপূর্ণভাবে সংবাদ

জানাতে পারেন। কাজেই এ ক্ষেত্রেও বার্তাবহের ভাষায় ও তাঁর জাতির ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে; এবং এটাই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক!

আসল ব্যাপার যাই হোকনা কেন, ধর্ম থেকে দূরে থাকার জন্য ধর্মবিরোধীরা এ সব যুক্তি পেশ করে থাকে। তাদের বিকৃত মানসিকতা সম্পর্কে কুরআান স্পষ্ট করেছে:

আমি যদি ভিনদেশী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম তবে তারা অবশ্যই বলতো, 'এর আয়াতগুলো বিশতভাবে বর্ণনা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা ভিনদেশী, অথচ রাসূল আরবীয়।' বলঃ ' মু'মিনদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার; কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেনো তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে।' (সূর- হা:মীম.. ৪৪)

এটা স্বাভাবিক যে নবী, তাঁর জাতি ও জাতির নিকট সম্পূর্ণ ও নিরঙ্কুশভাবে প্রকাশের জন্য, অধিকন্তু, ধর্মের ভিত্তি মজবুত রাখার লক্ষ্যে নিঃছিদ্র যোগাযোগ বজায় রাখার স্বার্থে নবী, জাতি ও গ্রন্থের মধ্যে এরকম একতা থাকতে হয়। তাই এ বিষয়টি এ অর্থ করেনা যে অন্যান্য জাতি কুরআান সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকবে বা তাদের জবাবদিহি করা হবেনা। কুরআানের অর্থ বা ব্যাখ্যা অন্য যে কোন ভাষায় অতি সহজে করা যায়। বাস্তবেও সেটাই হচ্ছে। সুতরাং ভাষাগত এ দাবি ধর্ম বুঝতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা।

স্রষ্টা কর্তৃক নিজকে বুঝাতে 'আমরা' ব্যবহার বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ নিজকে বুঝাতে কুরআানের অনেক জায়গায় 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। এর কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে:

আমরা মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি ও তারপরে ক্রমানুয়ে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি; আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মা যোগে তাকে শক্তি সম্পন্ন করেছিলাম; কিন্তু যা তোমাদের নিম্নপ্রবৃত্তি চাইতোনা এমন কোন কিছু নিয়ে কোন রাসূল-

তোমাদের নিকট উপস্থিত হলো, তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে কাউকে মিথ্যাবাদী বললে এবং কাউকে হত্যা করলে।
(সূর- বাক্ব-র-হ্ ৮৭)
যে নিজেকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইব্রাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? আমরা তাকে এ পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, সে পরকালে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হবে।(সূর- বাক্ব-র-হ্ ১৩০)

অজ্ঞানীরা 'আমরা' শব্দটিকে বহুবচন গণ্য করে বলে যে আল্লাহ্ এক জন হলে তাঁর ক্ষেত্রে বহুবচনবাচক 'আমরা' শব্দটি ব্যবহৃত হতোনা। সুতরাং একাধিক ইলা বা মায়:াবূদ আছে। তারা এ কথা বলে মনে করে যে তারা এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সাধন করেছে। তবে এটা বুঝা অতি সহজ যে ভাসাভাসা ধারণা ও অজ্ঞতার সমন্বয়ে অগ্রসর হওয়ার কারণে এ ভুল ব্যাখ্যার অবতারণা ঘটেছে। আরবী ভাষায় 'আমরা' সর্বনাম শুধুমাত্র বহুবচন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়না; মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান, গৌরব, উচ্চ মর্যাদা ও পদ বুঝাতেও বা অধিক গুরুত্ব দিতে 'আমরা' একবচনার্থে ব্যবহৃত হয়। এ বিবেচনায় অল্লাহ্কে বুঝাতে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আরবীতে যে অর্থে 'আমরা' ব্যবহৃত হলো অনুরূপভাবে ফ্রেন্স বা অন্য বিদেশী ভাষায় বিনম্র অর্থে 'তুমি' বুঝাতে 'আমরা' ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া কুরআানের মূল ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি হল অল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবদেবী বা ইলাহ্ নেই; আর একমাত্র আল্লাহ্ উপাসিত হবেন। এ সত্যটি কুআানের বহু জায়গায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে:
এটাই সত্য বিবরণঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই- আল্লাহ অতীব সম্মানী, অতীব প্রজ্ঞাময়। (সূর- য়িःমর-ন ৬২)
... আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন মা'বূদ নেই, যিনি একক, পরাক্রমশালী। (সূর- ছদ ৬৫)
সুতরাং তুমি জান যে আল্লাহ ব্যতীত কোন বা'বূদ নেই এবং তোমার ত্রুটির জন্য এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটি জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর । আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে জানেন।
(সূর-মুহ:াম্মাদ ১৯)

কাজেই এখন এ কথাটি পরিষ্কার যে স্রষ্টা নিজেকে বুঝানোর জন্য 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন; বহুবচনিক অর্থে নয় বরং এর দ্বারা নিজ চমতকারিত্ব, সম্মান ও পবিত্রতা বুঝিয়েছেন।

আসলে, মূল উদ্দেশ্য বুঝার জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দ ব্যবহার ধরতে খুব বেশী সতর্কতার প্রয়োজন হয়না। যুক্তি প্রদর্শনের সামান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তিও এ শব্দে নিহিত মাধুর্য অনুভব করতে পারবে।

কুরআনের নানা উদাহরণ বুঝতে না পারা

কুরআান এমন একখানি গ্রন্থ যা সতর্ক, চিন্তাশীল ও অকপট লোকেরা সহজে বুঝতে পারে। গুণহীন লোক, বিশেষতঃ যারা অসচেতন, যুক্তি প্রদানে অক্ষম ও মতলবি - তারা কখনও কুরআান বুঝতে পারবেনা কিংবা এর রহস্যময়তা ও সূক্ষ্মতর বিষয় উদ্ঘাটন করতে পারবেনা। যে সমস্ত উদাহরণ দিকনির্দেশন ও উপদেশ দেয় তাদের সম্পর্কেও এ কথাটি সমভাবে সত্য। সন্দেহবাদীরা কিভাবে উদাহরণ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় সে বিষয়ে; অধিকন্তু, তারা কিভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে, কুরআানের একটি আয়াত আলোকপাত করে:

আল্লাহ্ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না; সুতরাং যাদের ঈমান আছে তারা বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে; আর যারা কাফির হয়েছে তারা সর্বাবস্থায় এটাই বলবে, 'এসব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহ আমাদের কি বুঝাতে চান?' তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই (পাপাচারী) বিপথগামী করে থাকেন।(সূর- বাক্ব-র-হ্ ২৬)

যে কোন বিশ্বাসী ডাঁশ বা মশা এর উদাহরণ থেকে বুঝতে পারে যে আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা তাঁর উৎকৃষ্ট কর্তৃত্ব বুঝান। প্রায় এক সেন্টিমিটার লম্বা এক্ষুদ্র প্রাণী দ্বারা তাঁর সুষম ও অনন্য সৃষ্টির উদাহরণ দেন। এর অভ্যন্তরস্ত বস্তু, নির্মাণকৌশল ও কাঠামো যেকোন উন্নত উপকরণ এমনকি কম্পিউটারের চেয়েও জটিল। এরা আমাদের সময় পর্যন্ত উঠে এসেছে

এবং সৃষ্টির কাল থেকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। স্রষ্টা এ অদ্ভুত সৃষ্টিটির উদাহরণ টেনে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের উপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃত বিশ্বাসী এ উদাহরণ থেকে যৌক্তিক ভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে এ ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ স্রষ্টার সীমাহীণ জ্ঞান ও ক্ষমতার দরজা খুলে দেয়। যাহোক, ঐ সব অজ্ঞানী সংশয়বাদী অবিশ্বাসীরা তার চতুর্দিকের সৃষ্টি সম্পর্কে বুঝার জন্য চিন্তা ভাবনা নাকরে আশ্চর্যজনক প্রশ্ন করে," এ উদাহরণ দিয়ে স্রষ্টা কি বুঝাতে চান?"

কুরআনের পুনরুক্তি বুঝতে না পারা।

ঐ সব অজ্ঞ যারা কুরআনের পুনরুক্তির যৌক্তিক কারণ অনুধাবনে অক্ষম তাদের জন্য পুনরুক্তি বিভ্রান্তির একটি উৎস। কুরআনের কিছু নিদৃষ্ট জায়গায় কিছু বিষয় বা আয়াত পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সর্বত্র ধর্মের মূলনীতি যেমন - আল্লাহ্‌র একত্ব, ইস্তফা, ছাড়, স্রষ্টার প্রার্থনার গুরুত্ব, এ বিশ্বের অস্থায়ী প্রকৃতি, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহ্‌র পথে জীবনোৎসর্গ স্মরণ করিয়ে দিতে কুরআনের কোন ঘটনা, উদাহরণ ও উপদেশ বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এমন ও উদাহরণ আছে যে কুরআনের এক আয়াত অন্যত্র হুবুহু তুলে ধরা হয়েছে।

এসবের অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মানুষের মন ও হৃদয়ের মধ্যে দরকারী বিষয়সমূহ গেঁথে দেয়ার জন্য যখনই সুযোগ এসেছে তখনই বিষয়সমূহ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে জীবনের অপরিহার্য প্রতিটি বিষয় তখনই ধরতে সুবিধা হয় যখন তা বিভিন্ন উদাহরণ ও ঘটনা দ্বারা বারংবার পরিবেষ্টন করা হয়।

কুরআনের সুবিদিত পুনরুক্তির মধ্যে সূর- আর র-হ্‌মানের একটি পংতি, " তবে তোমার প্রভুর কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?" এ কথাটি ৭৮ টি আয়াতের মধ্যে ৩১ বার উচ্চারণ করা হয়েছে। এ পুনরাবৃত্তি অতীব প্রাজ্ঞ; কেননা তা উদাসীন মানুষকে এক কৃতজ্ঞ ও ধ্যানমগ্ন পরিবেশে প্রেরণ করে যেখানে তারা আসমানের সৌন্দর্যের নানা উপকরণ নিয়ে ভাবতে পারে; আল্লাহ্‌র চমৎকার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রসারতা উপলব্ধি করতে

পারে। বিশ্বাসীর মনের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রশংসা ও উচ্চভাব এ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অধিকতর শক্তি অর্জণ করে। এ রকম নান্দনিক পদ্ধতিতে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন বিশ্বাসীদের অন্তরে কাঙ্খিত অনুভূতি পূর্ণ করে দেয়া হয়।

কুরআানের পদ্ধতি (স্টাইল) বুঝতে না পারা

কুরআানের প্রতিটি আয়াত স্রষ্টার অসীম জ্ঞানের স্মারক; আর এর প্রত্যেকটি বিষয় সুষম ও সংহত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন অংশে এক বিষয় পুঙ্খানপুংখ ও বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আবার অন্যকোন অংশে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে অগ্রসর হয়ে বোধগম্য করা হয়েছে। উদাহরণ- বিশ্বাসী, ফেরেস্তা বা অন্যকোন তৃতীয় পক্ষের বিবরণ বা প্রার্থনা কোন ধরনের ভূমিকা ছাড়া সরাসরি আয়াতে জানানো হয়েছে। কি কারণে এরকম বিষয় এরকম ভাবে পেশ করা হয়েছে তা প্রকৃত বিশ্বাসী সহজে উপলব্ধি করতে পারে।

যাহোক, সীমিত ধ্যানশক্তিসম্পন্নদের পক্ষে কুরআানের পদ্ধতি অনুধাবন করা কঠিন। যেহেতু কুরআান স্রষ্টার বাণী বহন করে সেহেতু এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য পাওয়ার চিন্তা অস্বাভাবিক। যেহেতু আল্লাহ্‌র বাণী প্রেরণ করেছেন সেহেতু সবটাই আল্লাহ্‌র কথা।

উদাহরণ সরুপ,সূর- ফতিহ:াহ্‌র শেষ চার আয়াতের কথা স্মরণ করা যেতে পারে:

আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট। (সূর- ফতিহ:াহ্‌ ৪-৭)

এভাবে আল্লাহ্‌ একদম শুরু থেকে বিশ্বাসীদের জানিয়ে দেন যে কি ভাবে তাঁর নিকট প্রার্থণা করতে হবে। কিন্তু তিনি এরকম কোন সূচনা বক্তব্য রাখেননি যে 'এ ভাবে তাঁর নিকট প্রর্থনা করতে হবে', কারণ, পরিস্থিতিটা ভিন্নতর। অনুরূপ উদাহরণ সূর- বাক্বারহ্‌র শেষ আয়াতে পাওয়া যায়:

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ্ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না; কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং সে যা (অন্যায়) করেছে তা তারই উপর বর্তায়। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা না জেনে ভুল করি তজ্জন্যে আমাদেরকে শাস্তি দেবেননা, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ ভার অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেন না; হে আমাদের প্রভু, যা আমাদের শক্তির অতীত ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের দয়া করুন; আপনিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূর- বাক্ব-র-হ্ ২৮৬)

সংবেদনশীল যে কেউ সহজে লক্ষ্য করবে যে আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা প্রার্থনার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন এবং সঠিক বিশ্বাসীমাত্র এ ভাবে প্রার্থণা করবে। বিপরীত ক্রমে অজ্ঞজন এ আয়াতের প্রকৃত প্রকৃতি ধরতে পারবেনা; ফলত শয়তান কর্তৃক পরিচালিত হবে।

ছয়দিনে সৃষ্টির বিষয়ে

কুরআনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে স্রষ্টা ছয় দিনে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তবে, আরেকটি অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যেখানের হিসাব মতে সব সৃষ্টির জন্য আট দিন সময় লেগেছে। যারা এর পিছনের যুক্তি অনুধাবন করতে পারেনা তারা যে আয়াতে ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছে সে আয়াত টেনে এনে কুরআনের বৈপরীত্য অনুমান করে। আয়াতগুলো উত্থাপন করা হলো:

বল ঃ 'তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে আর তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক।' তিনি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে (এতে জবাব রয়েছে) জিজ্ঞাসুদের জন্য। তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন তখন যা ছিল ধূম্র বিশেষ। অতপর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেনঃ 'তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' তারা বললোঃ 'আমরা আসলাম অনুগত

হয়ে।' অতপর তিনি দু'দিনে আকাশ মন্ডলকে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন, প্রত্যেক আকাশের নিয়ম ব্যক্ত করলেন। আমরা নিম্ন আকাশকে আলো দিয়ে সুশোভিত ও সুরক্ষিত করলাম। এ হলো সর্ব শক্তিমান ও সর্বাজ্ঞের ব্যবস্থাপনা। (সূর- হা:মীম.. ৯-১২)

উপরি-উক্ত আয়াতে উল্লিখিত দিনগুলোর হিসাব করলে ৮ দিন হয়। অপর পক্ষে সূর- ইয়:নুছ এর ৩ নং আয়াতে বলা হয় যে আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যবর্তী সব কিছু তিন দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এক জন ভাসাভাসা পাঠকের নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়; সে তার মন ও যুক্তি দিয়ে ষিয়টি গভীর ভাবে বুঝার চেষ্টা করেনা। কুরআানে ভুল ও বৈপরীত্য খোঁজার জন্য যে অগ্রসর হয় সে এ বিষয়টি বারবার বলে বেড়ায়।

কোন ব্যক্তি যদি মনোনিবেশ ও বিবেচনা সহকারে দেখে তবে সে এতে আদৌ কোন বৈপরীত্য দেখবেনা। আমরা যদি এ আয়াতে উল্লিখিত সময়ের ব্যাপ্তির প্রতি মনোসংযোগ করি তাহলে নিম্নলিখিত হিসাব পাই:

- জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনাপোকরণ, পশু-পাখী বা পরিবেশ তৈরী হওয়া পর বিশ্ব চালু হতে চার দিন সময় লেগেছিল।
- পৃথিবীসহ বিশ্বের আকৃতি প্রদান বা এক কথায় বিশ্ব সৃষ্টিতে চার দিনের মধ্যে প্রথম দু'দিন লেগেছিল। সুতরাং এদু'দিন প্রথম চার দিনের ব্যাপ্ত সময় থেকে আলাদা নয়। আরও সংক্ষেপে বলা যায় যে চার দিনের প্রথম দু'দিন পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।
- একাদ্বশও দ্বাদশ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে দু'দিনে আকাশ গঠিত হয়েছে বা সোজা কথায় মোট ছয়দিন লেগেছে।

সৃষ্টির ছয় দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি ধাপ সৃষ্টিতে কি পরিমাণ সময় লেগেছে তা আলাদা আলাদা ভাবে আয়াতে বলা হয়েছে।

এখানে স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন যে এ দিন মানে চব্বিশ ঘন্টার দিন নয়, দিন বলতে একেকটি ব্যাপ্তসময় বা পর্যায়কে বুঝানো হয়েছে।

'হামান' নামটি সম্পর্কে অনুমান

কুরআানে অসামঞ্জস্য অন্বেষণকারীগণ 'হামান' নামে এক ব্যাক্তির কথা স্মরণ করায় - কুরআানে যাকে ফেরাউনের এক জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৌরতে নবী মুসা সম্পর্কে আলোচনাকালে হামান নামটি ব্যবহার করা হয়নি। তবে বিপরীতক্রমে ইঞ্জিলে বলা হয় যে নবী মুসার ১১০০(এক হাজার একশত) বছর পূর্বে বেবিলন রাজার সহকারী হিসাবে পরিচিত ঐ ব্যাক্তিকে ইয়াহূদি সম্প্রদায় হত্যা করেছিল।

যারা বলে যে নবী মুহ:াম্মাদ (ছ-) তৌরাত ও ইঞ্জিলের আলোকে কুরআান লিখেছন; তারা এও দবী করতে পারে যে তিনি কিছু আপত সত্য কিন্তু ভুলকে ভুল করেই কুরআানে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ দাবির হাস্যকর দিক তখন স্পষ্ট হয় যখন প্রায় ২০০ বছর আগে মিশরের চিত্রলিপি আষ্কারের মাধ্যমে 'হামান' নামটি উদ্ধার করা হয়।

যদিও হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচীন মিশরীয়দের ভাষা বা চিত্রলিপি বর্তমান ছিল তবু এর আগ পর্যন্ত তাদের চিত্রলিপির কোন পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যাহোক, খৃষ্টীয় দ্বিতীয়ও তৃতীয় শতকে খৃষ্টান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রসার ও প্রভাবে মিশরীয়রা তাদের ধর্ম ও ভাষা ভুলে যায় এবং চিত্রলিপি ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। সর্বশেষ পরিজ্ঞাত সময় অনুযায়ী খৃষ্টের জন্মের ৩৯৪(তিন শত চুরানব্বই) বছর আগে চিত্রলিপি ব্যবহার হতো। অতপর সবাই এ ভাষা ভুলে যায় এবং প্রায় ২০০(দুই শত) বছর আগ পর্যন্ত এ ভাষা পড়া বা বোঝার মতো কেউ জীবিত ছিলনা।

খৃষ্টের জন্মের ১৯৬ (এক শত ছিয়ানব্বই) বছর পূর্বের 'রোছেটা স্টোন' নামের প্রাচীন মিশরীয়দের লিপি ফলকটির লিপিচিত্র ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করা হয়। এ লিপি ফলকটির বৈশিষ্ট্য হলো তিনটি পৃথক পৃথক লিপিপদ্ধতির ব্যবহার: চিত্রলিপি, চিত্রলেখ (সহজকৃত চিত্রলিখন) ও গ্রীক ভাষা।

গ্রীক ভার্সনের সহায়তায় প্রাচীন মিশরীয়দের ভাষা উদ্ধার করা হয়। জীন ফ্র্যাঙ্কোইজ চ্যাপোলিয়ন নামের এক জন ফরাসী সমগ্র চিত্রলিপিটির পাঠোদ্ধার সম্পন্ন করেন। এ ভাবে ফলকটিতে ধারণকৃত একটি হারিয়ে

যাওয়া ভাষা ও ইতিহাস পুনঃজীবন পায়। এ আবিষ্কার প্রাচীন মিশরীয়দের সভ্যতা, বিশ্বাস ও জীবনযাপন সম্পর্কে গবেষণা সম্ভব করে তোলে।

আমরা এখন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সে সম্পর্কেও তা থেকে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 'হামান' নামটি মূলতঃ প্রচীন মিশরীয় লিপি ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে ভিয়েনার হফ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি স্মৃতিস্তম্ভে শব্দটি পাওয়া যায়; তাতে ফিরাউনের সাথে হামানের ঘনিষ্টতার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

অভিধান অনুযায়ী 'নতুন রাজ্যের জনগণকে' হামান অর্থাৎ 'পাথর খোদাইকারীদের প্রধান' বলা হয়।

এ অবিষ্কার প্রকৃত অর্থে এক আশ্চর্যজনক ঘটনাকে তুলে আনে। হামান, কুরআান বিরোধীদের দাবীর বিপরীতে, সত্যিসত্যি এক জন মানুষ ছিলেন যিনি নবী মুসার আমলে মিশরে বাস করতেন; এবং কুরআানে যেমনটি বলা হয়েছে তেমনি ভাবেই তিনি ফিরাউনদের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন আর বাছাইযন্ত্র নির্মানের ব্যবসা করতেন।

ফিরাউন কিভাবে হামানকে মিনার বানানোর জন্য অনুরোধ করেছিল সে সম্পর্কে কুরআানের বর্ণনার সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক গষেণায় বাস্তবিক ভাবে হুবুহু মিল পাওয়া যায়।

ফিরআ'উন বললোঃ 'হে পারিষদ ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না! হে হামান ! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর; হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার মা'বূদকে দেখতে পাবো। তবে আমি অবশ্য মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী।' (সূর- কুছছ ৩৮)

পরিশেষে, সিদ্ধান্ত এই, প্রাচীন মিশরীয় স্মৃতি ফলকে হামান নামের অবিষ্কার দ্বারা কুরআানে বৈপরীত্ব অন্বেষণকারীদের আরেকটি দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু, এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, র-সূলের সময়ে 'অজ্ঞাত' সত্য কুরআান দ্বারা অলৌকিক ভাবে জানানোর মাধ্যমে স্রষ্টা যে কুরআান প্রেরণ করেছেন সে সত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

নুহ্‌র বন্যা সম্পর্কে অনুমান

অস্বীকারকারীরা যে সব ঘটনার যৌক্তিক ব্যাখ্যা পায়না আর এ কারণে বিরোধিতা করে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো নুহ্‌র বন্যা। তারা বলে যে পৃথিবীর সর্বত্র যে বন্যা হয়েছিল তা বাস্তব বা টেকনিক্যাল কারণে সম্ভব নয়। তাই তারা বলে, যেহেতু কুরআান এ রকম অবাস্তর কথা বলে সেহেতু তা স্রষ্টার কথা নয়।

আর যেহেতু কুরআান অল্লাহ্‌ থেকে প্রেরিত এবং একমাত্র অবিকৃত পবিত্র গ্রন্থ সেহেতু তাদের এ দাবিও সঠিক নয়। অধিকন্তু, লক্ষ্যণীয় যে তৌরত ও অন্যান্য সংস্কৃতি নুহ্‌র বন্যাকে যেভাবে লালন করে কুরআান সে রকমটা করেনা।

রদবদলকৃত তৌরতে বলা হয় যে বন্যা ছিল বিশ্বজনীন যা সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করেছিল। বিপরীতক্রমে, কুরআান বন্যার বিশ্বজনীনতার কথা বলেনা। উল্টা বলে যে বন্যা বিশ্বজনীন নয় বরং আঞ্চলিক ছিল; নুহ্‌র যে জাতি তাঁকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকেই শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

নবী হুদকে যেমন আদ (সূর- হুদ ৫০) এবং নবী সলিহ্‌কে যেমন সামুদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল তেমনি নবী নুহ্‌কে তাঁর নিজ জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল আর বন্যা কেবলমাত্র তাঁর জাতিকেই ধ্বংস করেছিল:

আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি,(নূহ বললেন) 'আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী। তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো ইবাদত করো না, আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' (সূর-হূদ ২৫-২৬)

যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল তারা অস্বীকারকারী ছিল এবং তারা নবীর আবির্ভাবকে ক্রমাগত বিরোধিতা করেছিল। বিষয়টি নিয়ে যে আয়াত বর্ণনা করে তা আর কোন যুক্তির অবকাশ রাখেনা:

কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, ফলে তাঁকে এবং তাঁর সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। তারা এক অজ্ঞ ও ভ্রান্ত সম্প্রদায় ছিল। (সূর- য়:ার-ফ ৬৪)

অতঃপর আমি তাঁকে (হূদকে) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিল না তাদের মুলোৎপাটন করে ছাড়লাম। (সূর- য়াঃর-ফ ৭২)

আমরা দেখতে পাই, কুরআান বলে যে গোটা পৃথিবী নয়; একমাত্র নুহ্‌র জাতির মানুষদের ধ্বংস করা হয়েছিল। কুরআানে নুহ্‌র বন্যার কথা এভাবে স্পষ্ট করে বলা সত্ত্বেও এর বিশ্বজনীনতার দাবী করার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্য আছে বই অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

প্রকৃতার্থে, কুরআান তৌরত ও ইঞ্জিলের মতো নানা অযৌক্তিক ও বিকৃত উপকথা দ্বারা পূর্ণ না থাকায় এটা প্রমাণিত হয় যে এ আল্লাহ্‌র বাণী এবং অল্লাহ্ কর্তৃক সংশোধতি ও প্রকৃত ঘটনার সঠিক ভাষ্য।

কুরআানের পক্ষে নুহ্‌র বন্যাকে আরো একটি কারণে বিশ্বজনীন বলা সম্ভব নয়; কারণ, কুরআান বলে যে কোন জাতির নিকট কোন নবী প্রেরণের পূর্বে ঐ জাতিকে ধ্বংস করা হয় না। প্রলয় তখনই ঘটে যখন কোন জাতিকে পথ দেখানোর জন্য কোন নবী বা বার্তাবহ্ প্রেরণ করা হয় কিন্তু সে জাতি ঐ নবীকে প্রত্যাখ্যান করে। সূর- কৃছছ বিষয়টি নিম্নলিখিত ভাবে বলা হয়েছে: **তোমার প্রতিপালক কোন জনপদ প্রধানের নিকট আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে ঐ জনপদ ধ্বংস করেননা এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুলুম করে। (সূর- কৃছছ ৫৯)**

অধিকন্তু আরেকটি পংক্তি বলে:

"যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য করবে। যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য হবে। কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না; আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেইনা।" (সূর- য়িসূর-য়িল ১৫)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কোন জাতির নিকট কোন নবী প্রেরণ নাকরে সে জাতি ধ্বংস করা স্রষ্টার আইন পরিপন্থি। নবী নুহ্ কেবল মাত্র তাঁর জাতিকে স্মরণ করানোর জন্য প্রেরিত

হয়েছিলেন। এ কারণে স্রষ্টা কেবলমাত্র নুহ্‌র জাতি ধ্বংস করেছিলেন; যে সমস্ত জাতি নবীর অপেক্ষায় তাদের ধ্বংস করেননি।

এ বন্যা বিতর্কের আরেকটি দিক হলো সে অঞ্চলের সকল পাহাড় পর্বত বা সকল চূড়া বন্যায় ডুবেছিল কিনা কিম্বা সে উচ্চতা পর্যন্ত পানি পৌঁছেছিল কিনা। কুরআান বলে যে বন্যার পরে জাহাজটি 'জুদি' পাহাড়ের উপর বিশ্রাম নিয়েছিল। 'জুদি' শব্দটি একটি বিশেষ পাহাড় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্ত আরবী ভাষায় কোন স্থানের শীর্ষতম জায়গা বুঝাতে 'জুদি' ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বিকৃত তৌরতের বক্তব্যের বিপরীতে আমরা কুরআান থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বন্যা সমগ্র পৃথিবী এবং সকল পাহাড়পর্বত গ্রাস করেনি বরং একটি বিশেষ অঞ্চল আবৃত করেছিল।

অধিকন্তু, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এ বন্যা কোন বৈশ্বিক ঘটনা ছিলনা বরং এটি একটি আঞ্চলিক ঘটনা ছিল; যে বন্যায় মেসপটেমিয়ার ব্যাপক এলাকা ডুবে গিয়েছিল।

উপসংহার

প্রধানত কি কি কারণে মানুষ কুরআানকে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারেনা সে সম্পর্কে এ পুস্তকে বিশ্লেষণ করা হলো। বিশ্বাস থেকে বহু দূরে অবস্থানকারীদের কর্তৃক অজ্ঞানতা প্রসূত ব্যাখ্যার কিছু উদাহরণ আলোচনা করা হলো। যারা অকপটতা ও বিশ্বাস থেকে বহুদূরে থাকে তারা সহজতম আয়াত বুঝতে কিরূপ ব্যর্থ হয় এবং এ ব্যর্থতা সম্পর্কে মূল্যয়ন বা বিশ্লেষণ করাও এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল।

আমদের স্মরণ রাখতে হবে যে কুরআান ও ইসলাম সম্পর্কে একজন অজ্ঞলোক তার সীমিত যোগ্যতা দিয়ে অসংখ্য বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে পারে। এর কারণ হলো কুরআান একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে যা কেবল যুক্তি ও অকপটতা দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব। সুতরাং এসব কারণে অজ্ঞলোকের তৈরীকৃত ব্যাখ্যায় ও আপত্তিতে অসংগতি দেখে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

একজন প্রকৃত বিশ্বাসী অন্যদের নিকট থেকে আশা করে যে তারা তার মতই যুক্তিসম্পন্ন হবে; কিন্তু এর বিপরীতে এধরনের নির্বুদ্ধিতা ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা দেখে সে বিস্মত হয়। যাহোক, কুরআান বলে যে অবিশ্বাসীদের কোন যুক্তি বা বুদ্ধি নেই। কুরআানী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা যদি অবিশ্বাসীদের অজ্ঞ ব্যাখ্যা গুলো অবলোকন করি, আমরা আর বিস্মিত হবোনা বরং এগুলোকে সতর্কীকরণ ও নিদর্শন হিসাবে গণ্য করবো।

কুরআান স্রষ্টার সত্য গ্রন্থ এবং তা পরিষ্কার। সুতরাং কোন অনুমানের উপর নির্ভর করে এর উপর সন্দেহ পোষণ করা অনুচিৎ। অবিশ্বাসীরা তাদের বিবেককে অবদমিত করার চেষ্টা করে এবং নিজদের ও নিজ অনুসারীদেরকে নানা ভ্রান্তযুক্তি দিয়ে বোকা বানায়।

অধিকন্তু, প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকট মনগড়া প্রতিটি যুক্তির প্রতিউত্তর করার মতো সময় বা প্রয়োজন কোনটাই নেই।

খাঁটি বিশ্বাসীর দায়িত্ব হলো কুরআানের ঘটনা ও অলৌকিকত্ব অন্যের নিকট পৌছানো। সত্য এলে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কুরআান এ আয়াতে

তাই বলেঃ কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, দুর্ভোগ তোমাদের ! তোমরা যা বলছো তার জন্যে। (সূরা- আম্বিয়াঃ ১৮)

মিথ্যা সর্বদা বিলুপ্ত হবেইঃ

আর বলঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। (সূরা- ইস্‌রা-য়িল ৮১) আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্যে আরোগ্য ও দয়া, কিন্তু তা সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা- ইস্‌রা-য়িল ৮২)

বিবর্তনবাদী প্রবঞ্চনা

বিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তথ্য উপরওয়ালার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। উল্টো দিকে, বস্তুবাদ বিশ্বে সৃষ্টির বাস্তবতাকে অস্বীকার করে; যে অস্বীকার অবৈজ্ঞানিক ভ্রম বৈ কিছু নয়।

বস্তুবাদ একবার মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে এর উপর প্রতিষ্ঠিত সকল মতবাদ মিথ্যা হতে বাধ্য। বস্তুবাদ বা এরকম তত্ত্বের শীর্ষস্থানে রয়েছে ডারউইনবাদ বা বিবর্তনবাদ। আল্লাহ্ কর্তৃক বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সর্বস্বীকৃত হওয়ায় নির্জীব বস্তু থেকে ঘটনাচক্রে প্রাণ সৃষ্টির মতবাদ ধ্বংস হয়। আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাগ রস বলেন:

নিরীশ্বরবাদ, বিবর্তনবাদ বা বিশ্ব শাশ্বত এমন ভ্রান্ত অনুমান ভিত্তিক বহু মতবাদ অষ্টম থেকে বিংশ শতকের মধ্যে পৃথিবীতে তৈরী হয়েছে। তবে আমরা আজ সে অসাধারণত্বের মুখোমুখী যে অসাধারণত্ব বলে যে প্রতিটি বিষয়ের, এমনকি জীবনের পিছনেও কারণ বা কারণ সৃষ্টিকারী রয়েছেন।[1]

তিনি আল্লাহ্ যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নক্সা করেছেন। সুতরাং ডারউইন মতবাদে কথিত ঘটনাচক্রে প্রাণ সৃষ্টির তত্ত্বটি সত্য নয়।

অধিকন্তু, এটা মামুলি যে আমরা যখন বিবর্তন বাদে নজর দেই তখন স্বাভাবিক ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা এ মতবাদ ভর্ৎসিত হচ্ছে।

জীবনের নক্সা চরম জটিল ও বিস্ময়কর। উদাহরণ স্বরূপ জড় জগৎ দেখলে আমরা অনুর মধ্যে কত অদ্ভুৎ রকমের ভারসাম্য লক্ষ্য করি; অনরূপভাবে জীব জগৎ দেখলে অনু, প্রোটিন, এন্‌জাইমের জটিল সমন্বয়ে কোষের সৃষ্টি লক্ষ্য করি।

বিংশ শতকের শেষ দিকে জীবনের অনন্য গঠন নক্সা আবিষ্কার ডারউইন বাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে।

ডারউইন বাদের বৈজ্ঞানিক অবসান

প্রাচীন গ্রীস যুগ থেকে 'উদ্ভব' অনুমান রূপে চালু থাকলেও ১৯ শতকে এটা 'বিবর্তন বাদ' হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। চার্লস ডারউইন লিখিত গ্রন্থ দ্যা *অরিজিন অব স্পেসিজ* ১৮৫৯ সালে প্রকাশের মাধ্যমে বিবর্তনবাদ চূড়ান্ত রূপ নেয়। এ গ্রন্থে ডারউইন অস্বীকার করেন যে স্রষ্টা কর্তৃক নানা জীব পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর মত অনুযায়ী সকল জীবের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল আর সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে তা ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে বহুমুখী রূপ নিয়েছে।

বাস্তবে ডারউইন মতবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভিত্তিক নয়; তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে বিবর্তন মতবাদটি একটি 'অনুমান'। অধিকন্তু, এ বইয়ের 'ডিফিকাল্টিজ অব দ্যা থিওরী' অধ্যায়ে ডারউইন প্রয়োজনীয় গবেষণার অভাবের বিষয়টিও স্বীকার করেন; অধিকন্তু, তত্ত্বটি নানা সমালোচনামূলক প্রশ্নের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়।

ডারউইন তার সকল আস্থা কথিত নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের উপর স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে এ আবিষ্কার তত্ত্বীয় অচলাবস্থা ('ডিফিকাল্টিজ অব দ্যা থিওরী') দূর করবে। যা হোক, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার প্রত্যাশার বিপরীতে তত্ত্বীয় অচলাবস্থা বৃদ্ধি করেছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা ডারউইনবাদের পরাস্ত হওয়াকে তিনটি মূল বিষয়ের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যায়:

১) পৃথিবীতে জীবন কি ভাবে সৃষ্টি হলো তা এ মতবাদ কোন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনা।

২) এ মতবাদে বর্ণিত 'বিবর্তন কার্যসাধন পদ্ধতি' স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে পারে এমন দাবির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

৩) জীবাশ্ম ইতিহাস এ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য পেশ করে।

এ অংশে আমরা এ তিনটি মূল বিষয় সংক্ষেপে পরীক্ষা করব:

প্রথম অজেয় পদক্ষেপ: জীবনের উৎস

বিবর্তনবাদ তর্কের খাতিরে ধরে নেয় যে ৩.৮ বিলিয়ন বর্ষ আগে আদিম বা প্রাথমিক পৃথিবীতে সৃষ্ট একটি কোষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সকল জীবিত সম্প্রদায় (স্পেসিজ) এসেছে। কিভাবে একটি একক কোষ বিবর্তনের দ্বারা মিলিয়ন মিলিয়ন জটিল কোষের জন্ম দিল এবং জীবাশ্ম ইতিহাসে তার কোন রেকর্ড নেই কেন - এ সব প্রশ্নের জবাব এ মতবাদে পাওয়া যায়না। যাহোক, এবার বিবর্তন বাদের কাছে সর্বপ্রথম ও সর্বগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো 'প্রথম কোষ'টি কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

যেহেতু বিবর্তনবাদ স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যে সৃষ্টিতে কোন অলৌকিক অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেনা; তাই এ বাদ বলে যে 'প্রথম কোষ' প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কাকতলিয় ভাবে উৎপত্তি লাভ করেছিল। মতবাদটি অনুসারে, কাকতালিয় ঘটনার ফলে অজৈব পদার্থ থেকে জীবন্ত কোষের উৎপত্তি ঘটে। সত্য কথাটি এই যে এ দাবিটি জীববিজ্ঞানের সরলতম নিয়মের সাথেও খাপ খায়না।

'জীবন আসে জীবন থেকে'

ডারউইন তার পুস্তকে জীবনের উৎস সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্বে, ডারউইনের সময়ের বিজ্ঞান এরকম অনুমান করত যে জীবন্ত প্রাণী খুব সহজ প্রকৃতির গঠনকাঠামো বহন করে। মধ্য যুগ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্মতত্ত্ব বলে এসছে যে অজৈব পদার্থ মিশ্রিত হয়ে জৈব প্রাণী সৃষ্টি করেছে যা সে সময় পর্যন্ত সচার আচার ব্যাপক ভাবে গৃহিত হয়ে থাকতো। সে সময় পর্যন্ত চিরাচরিত ভাবে বিশ্বাস করা হতো যে খাদ্যের এঁটো থেকে কীটপতঙ্গ আর গম থেকে ইঁদুর জন্ম গ্রহণ করে। এ তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য কৌতুহল উদ্দীপক গবেষণা করা হয়েছিল - এক টুকরা ময়লা কাপড়ের উপর কিছু গম রাখা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে কিছু সময় পরে ইঁদুর জন্মাবে। অনুরূপভাবে গোশ্তের মধ্যে পোকার উৎপত্তি কে স্বতঃস্ফূর্ত প্রজন্মতত্ত্বের সাক্ষ্য মনে করা হতো। যাহোক, কিছুদিন পরে বোঝা গেল যে গোশ্তের মধ্যে কীট জন্মায়না বরং মাছি

লার্ভা রূপে কীট নিয়ে এসে মাংসের মধ্যে স্থাপন করে - যা খালি চোখে দেখা যায়না।

ডারউইনের আমলে যখন 'দ্যা অরিজিন অব স্পেসিজ' লেখা হয় এমনকি তখনও মানুষ বিশ্বাস করতো যে অজৈব পদার্থ থেকে ব্যাক্টেরিয়া জন্ম নেয়; তখনকার বৈজ্ঞনিক জগৎ এ বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে মেনে নিয়েছিল।
মজার কথা হল, ডারউইনের বই প্রকাশের পাঁচ বছর পরে লুই পাস্তুর এ প্রচলিত বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণ করেন। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর গবেষণা শেষে পাস্তুর এ উপসংহার টানেন: "*অজৈব পদার্থ থেকে জৈব প্রাণ জন্ম নিতে পারে এমন দাবি ইতিহাসের পাতায় চির সমাহিত হলো।*"[2]

বিবর্তন বাদের সমর্থকগণ পাস্তুরের এ সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল ধরে প্রতিহত করে আসছিলেন। তবে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রাণকোষের জটিল গঠন বিষয় আবিষ্কৃত হওয়ায় 'কাকতলিয় ভাবে' জীবনের উৎপত্তির দাবি কোন-ঠাসা হয়ে পড়ে।

বিংশ শতকের অমীমাংসিত ঘটনা

বিংশ শতকে প্রথম যে বিবর্তনবাদি জীবনের উৎস সম্পর্কিত বিষয় তুলে ধরলেন তিনি হলেন রশিয়ার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী আলেকজেন্ডার ওপারিন। ১৯৩০ সালের দিকে বিভিন্ন রকমের গষেণার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে কাকতালিয় ভাবে জীব কোষের উৎপত্তি হতে পারে। যাহোক, এ সকল গবেষণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো আর মিঃ ওপারিন নিম্নলিখিত কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন:
জীবকোষের উৎপত্তির বিষয়টি, দুর্ভাগ্যক্রমে, সামগ্র বিবর্তনবাদের নিকট একটি প্রশ্ন হয়ে রয়ে গেল।[3]

ওপারিনের বিবর্তনবাদি অনুসারীগণ জীবনের উৎস আবিষ্কার করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। জানামতে এ সবরে মধ্যে মার্কিন রসায়নবিদ স্টেনলি মিলার ১৯৫৩ সালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা চালান। আদিম পৃথিবীর পরিবেশে উপস্থিত ছিল এমন গ্যাসিয় সংমিশ্রণ তৈরী এবং তৈরীকৃত মিশ্রণে শক্তি যোগ করে প্রটিনের মধ্যে পাওয়া যায়

এমন বিভিন্ন দৈহিক অনু (এমিনো এসিড) সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে উৎপাদন করলেন।

এর কয়েক বছর পার নাহতেই প্রমণিত হলো যে - যে পরিবেশের কথা ধারণা করে তা কৃত্রিমভাবে তৈরিপূর্বক উপর্যুক্ত গবেষণা করা হয়েছে তখনকার পৃথিবীতে বাস্তবে সে রকম পরিবেশ ছিলনা।[4]

দীর্ঘ নীরবতার পরে মিঃ মিলার স্বীকার করলেন যে তিনি গবেষণায় যে পরিবেশ মাধ্যম ব্যবহার করেছেন তা বাস্তবসম্মত ছিলনা।[5]

বিংশ শতকব্যাপী জীবনের উৎস বিষয়ে যত বিবর্তনবাদী গবেষণা হয়েছে তার সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্যানদিয়াগো স্ক্রিপ ইনস্টিটিউট এর ভূ-রসায়নবিদ জেফ্রে বাদা আর্থ ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনে এ কথা ১৯৯৮ সালে স্বীকার করেন:
পৃথিবীতে কিভাবে জীবনের উন্মেষ ঘটল এ অমীমাংসিত বৃহৎ প্রশ্নটির জবাব আজ বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে ও সমাধানের অপেক্ষায় রয়ে গেল।[6]

জীবনের জটিল কাঠামো

জীবনের উৎস সম্পর্কিত বিবার্তনবাদি তত্ত্ব এত বড় অচলাবস্থার মধ্যে নিঃশেষ হওয়ার মূল কারণ হলো - সহজ মর্মে আপত প্রতিভাত জীবন্ত বস্ত টিরও অবিশ্বাস্য রকম জটিল কাঠামো বহন। প্রযুক্তিগত ভাবে মানুষ যত কিছু উৎপাদন করতে পারে প্রাণির কোষ ততকিছুর চেয়ে অধিকতর জটিল। বর্তমান পৃথিবীর উন্নততম গবেষণাগারেও জড়পদার্থপুঞ্জ একত্রিত করে এখন পর্যন্ত জীবন্ত কোষ তৈরী করা যায়নি।

একটি জীবকোষ উৎপাদনের জন্য বাস্তবে এত বেশী সংখ্যক শর্ত প্রয়োজন হয় যা কেবলমাত্র কাকতালিয় ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া অবাস্তর। প্রটিনের ও কোষ ব্লকের সম্ভাব্যতা সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে পাশাপাশি করা হলে গড়ে $১০^{৯৫০}$ বার এর মধ্যে মাত্র ১ বার প্রটিন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যাতে

৫০০ এমনিক এসিড থাকবে; গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিতবারের চেয়ে কম $১০^{৫০}$ এর মধ্যে ১ বার সম্ভাবনাও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

কোষ কেন্দ্রে অবস্থিত ডি এন এ অনু এক অবিশ্বাস্য তথ্যব্যংক সমান তথ্য ভান্ডার জমা রাখে। হিসাব করে দেখা গেছে যে ডি এন এ-র মধ্যে রক্ষিত তথ্য লেখা হলে তার জন্য একটি বৃহদাকার লাইব্রেরির প্রয়োজন হবে যাতে প্রতি খন্ডে ৫০০ পৃষ্ঠা করে ৯০০ খন্ড এনসাইক্লোপেডিয়া রাখতে হবে।

এক্ষণে একটি আকর্ষনীয় উভয়সংকট ধরা দেয়: ডি এন এ কিছু বিশেষ প্রটিনের (এঞ্জাইম) সহায়তায় প্রতিরূপ ধারণ করতে পারে। যাহোক, বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এঞ্জাইম বাস্তবায়ন ডি এন এ রক্ষিত তথ্য দ্বারা করা সম্ভব। যেহেতু উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল তাই প্রতিরূপ তৈরীর জন্য উভয়কে একসাথে বর্তমান থাকতে হয়। ফলে বোঝা যায় যে জীবন এক পরস্পর বৈরী সাংগঠনিক অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালিফর্নিয়ার অন্ত র্গত সানদিয়াগো স্বিবিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদি অধ্যাপক লেজি অর্গেল সাইন্টিফিক ম্যাগাজিন এর সেপ্টেম্বর১৯৯৪ সংখ্যায় এ সত্য স্বীকার করেন:

এটা প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব যে প্রটিন ও নিউক্লিক এসিড সাংগঠনিক ভাবে জটিল, অথচ এরা স্বতস্ফূর্তভাবে একই সাথে ও একই সময়ে আবির্ভূত হয়। আরো অসম্ভব যে একটি ছাড়া অন্যটি অর্জন সম্ভব নয়। সতরাং, প্রথম দৃষ্টিতেই এ সিদ্ধান্তে পৌছতে হয় যে জীবণ বাস্তবে কখনো রাসায়নিক পথে উৎপত্তি লাভ করতে পারেনা।[7]

সন্দেহাতীত যে প্রাকৃতিক কারণে জীবণের সৃষ্টি, এটা আদৌ সম্ভব নয়, বরং এটা স্বীকার করতে হয় যে অলৌকিক পদ্ধতিতে জীবণ 'সৃষ্টি' করা হয়েছে। এ সত্যি 'সৃষ্টি' করাকে মিথ্যা দাবিকারী বিবার্তনবাদকেই মিথ্যা প্রমাণ করে।

বিবর্তনবাদের কাল্পনিক গঠন কৌশল

ডারউইনবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিবর্তনবাদের কথিত গঠনকৌশলের মধ্যে প্রকৃত বিবর্তনবাদি শক্তি নেই। প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে বিবর্তন ঘটে বলে ডারউইন দাবি করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনকে শক্তির স্থলাভিসিক্ত করার নজির তাঁর গ্যন্থের নামের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে: *The Origin of Species, By Means Of Natural Selectoin...*

ন্যচারাল সিলেকশন বা প্রকৃতিক নির্বাচন এ অর্থ করে যে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রাকৃতিক পরিবেশে অধিকতর খাপখাওয়াতে সক্ষম প্রাণী জীবন যুদ্ধে টিকে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ হরিণ পালের মধ্যে বেশী দৌড়ে সক্ষম হরিণই বেঁচে থাকবে। সতরাং টিকে থাকার জন্য হরিণ পালকে ক্ষিপ্রতর ও অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। যা হোক, এ কথা প্রশ্নাতীত যে এ গঠন কৌশল হরিণকে ঘোড়ায় রূপান্তরিত করার নিশ্চয়তা দেয়না।

সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোন বিবর্তনীয় শক্তি নেই। বিষয়টা ডারউইন জানতেন যা তাঁর বিবর্তনবদি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:
ঘটনাক্রমে অনুকূল পরিবর্তন নাঘটলে প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছু ঘটাতে পারেনা।[8]

ল্যাম্যার্যাকের প্রভাব

তাহলে কিভাবে অনুকূল পরিবর্তন ঘটে? ডারউইন তাঁর যুগের অপূর্ণ বোধসম্পন্ন বিজ্ঞানের ধারণা থেকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর পূর্বের ফরাসী জীববিজ্ঞনী ল্যাম্যারকের মতানুযায়ী জীবন্ত প্রাণী নিজ জীবনে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ও প্রজন্মে প্রজন্মে রেখে যায় - যা থেকে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করে। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী হরিণ জাতীয় প্রাণী মগডালের পাতা খাওয়ার প্রচেষ্টায় ধীরেধীরে ঘার বৃদ্ধি করে এক সময়ে দীর্ঘ ঘার সম্পন্ন জীরাফ এ পরিণত হয়।
ডারউইনও তাঁর বইয়ে অনুরূপ উদাহরণ টানেন, যেমন - কিছু শুকর খাদ্যান্বেষণে পানিতে নামতে নামতে এক সময় হাঙ্গরে রূপান্তরিত হয়।[9]

যাহোক, ২০ শতকে ম্যান্ডেল উদ্ভাবিত ও জীন বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত উত্তারাধিকারের নীতি - সময়ের সাথে সাথে অর্জিত ও প্রজন্মান্তরে প্রেরিত বৈশিষ্ট্যের দাবি অস্বীকার করে। এভাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বিবার্তনবাদি গঠনকৌশল হিসাবে গৃহীত হওয়া থেকে বাদ পড়ে গেছে।

নিও ডারউইনবাদ ও পরিবর্তন

বিবর্তন সম্পর্কিত একটি সমাধানের লক্ষ্যে ডারউইনবাদিরা আধুনিক মিশ্রতত্ত্ব তৈরি করে যা ১৯৩০ এর শেষ দিকে 'নিও ডারউইনবাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। নিও ডারউইনবাদ নয়া পরিবর্তন সংযোজন করে যাতে বলা হয় - বহিঃউপাদান, যেমন, রেডিয়েশন বা প্রতিকল্পভ্রম এর প্রভাবে জীবন্ত প্রাণীর জীনের ভিতর বিকৃতি ঘটে যা প্রাকৃতিক বিকৃতির সাথে 'অনুকূল পরবির্তনের কারণ' যোগ করে।

বর্তমান যুগে যে বিবর্তনের কথা বলা হয় তা নিও ডারউইনবাদ। এ তত্ত্ব এ কথা বলে যে পৃথিবীর মিলিয়ন মিলিয়ন জীবন্ত প্রাণী একটি পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছে যে পদ্ধতিটি থেকে কিছু সংখ্যক জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন - কান, চোখ, ফুসফুস, পাখা মিউটেশন বা পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টি; এ পরিবর্তনকে জেনেটিক বিশৃঙ্খলা বলা যায়। এ দাবির বিপরীতে বলতে হয় যে এ সম্পর্কিত সরাসরি বৈজ্ঞানিক তথ্য হল এ যে - মিউটেশন পদ্ধতি জীবন্ত প্রাণীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখেনা; এ তথ্যে আরো বলা হয়েছে যে মিউটেশন জীবন্ত প্রাণীর উন্নতি তো করেইনা বরং সর্বদা ক্ষতি করে।
ক্ষতি করার কারণ অতি সহজ: ডি এন এ র এক জটিল কাঠামো রয়েছে যার উপর যে কোন এলোপাথারি প্রভাব ক্ষতি সাধন করবে। আমেরিকার জীনতত্ত্ববিদ রঙ্গানাথন বিষয়টি নিম্ন লিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন:
মিউটেশন হল ক্ষুদ্র, এলোপাথারি এবং ক্ষতিকর। এটা কালেভাদ্রে ঘটে থাকে, আর এর ফলাফল সাধারণতঃ অকার্যকর হয়। মিউটেশনের এ চার বৈশিষ্ট্য এ ধারণা দেয় যে মিউটেশন বিবর্তনীয় উন্নয়ন ঘটাতে পারেনা। একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষত্ব সম্পন্ন অঙ্গে এলোপাথারি পরিবর্তন - হয় প্রতক্রিয়াহীণ হবে, নাহয় ক্ষতিকারক হবে। একটি ঘড়িতে এলোপাথারি পরিবর্তন ঘড়িটির উন্নয়ন করতে পারেনা। এতে খুব সম্ভবত ঘড়িটি

ক্ষতিগ্রস্থ হবে, নাহয় ঘড়ির উপর অকার্যকর ফলাফল হবে। ভূমিকম্প শহরের উন্নতি করেনা, বরং ধ্বংস আনায়ন করে।[10]

এটা বিস্ময়কর নয়, যতদূর জানা যায় জেনেটিক কোড উন্নয়নে প্রয়োজনীয় এমন কোন মিউটেশন আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। আর সকল মিউটেশন বা পরিবর্তন ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। বুঝা যায় যে 'বিবর্তন গঠন কৌশল' হিসাবে যে পরিবর্তনকে দেখানো হয় তা বাস্তবে জীবন্ত প্রাণীর অনিষ্ট করে ও তাকে বা তার অঙ্গকে অক্ষম করে। (মানুষের প্রতি মিউটেশনের প্রভাবে সাধারণত ক্যান্সার হয়)। এতে সন্দেহ নেই যে একটি বিধ্বংসী গঠনকৌশল 'বিবর্তনবাদী গঠনকৌশল' হতে পারেনা। অন্যদিকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজে কিছু করতে পারেনা' যা ডারউইনও স্বীকার করেছেন। এ সত্য ঘটনা প্রমাণ করে যে প্রকৃতিতে কোন 'বিবর্তন কৌশল' নেই। যেহেতু কোন 'বিবর্তনবাদী কৌশল' নেই সেহেতু এরকম কৌশল বাস্তবায়িত হয়েছে এমন কল্পনার কোন সুযোগ নেই।

ফসিল রেকর্ড: মধ্যবর্তী কাঠামোর নিশানা অনুপস্থিত

এ মর্মে পরিষ্কার প্রমাণ আছে যে বিবার্তনবাদ কর্তৃক বাতলানো দৃশ্যকল্প ফসিল রেকর্ডের (ফসিল ইতিহাসে) কোথাও নেই।

বিবর্তবাদ অনুযায়ী প্রতিটি জীবন্ত প্রজাতি কোন না কোন পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। অতীতে অস্তিত্ববান পূর্বপুরুষ কোন সময় অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে অতঃপর বর্তমান প্রজাতিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী এ রকম ধীরগতির রূপান্তর হতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর লেগেছে।

দাবি অনুযায়ী সত্যিই যদি রূপান্তর হত তাহলে এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব থাকত।
উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমান রূপ ধারণের পূর্বে অতীতে আধা মাছ/ আধা সরিসৃপ ধরনের কোন প্রাণী থাকতো। অথবা বর্তমান রূপ অস্তিত্বের পূর্বে সরিসৃপ-পাখি বা মধ্যবর্তী কোন রূপ থাকতো। যেহেতু এ সময়টা মধ্যবর্তী

সময় সেহেতু এরা অক্ষম, ত্রুটিপূর্ণ, বিকৃত জীব হতো। এদের বিবর্তনবাদীরা 'পরিবর্তনমূলক কাঠামো' বলে বিশ্বাস করে।

বাস্তবে যদি এ রকম প্রাণী থাকতো তাহলে তারা মিলিয়ন মিলিয়ন বা বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন সংখ্যার বা জাতের হতো। আরো গরুত্ব সহকারে বলা যায় যে এসব অদ্ভুৎ প্রাণীর অস্তিত্ব ফসিল ইতিহাসে (রেকর্ডে) থাকতো। যে কথা 'দ্যা অরিজিন অব স্পেসিজ' গ্রন্থে ডারউইন ব্যাখ্যা করেন:

আমার তত্ত্ব যদি সত্য হয়, একই দলীয় বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংযোগকারী অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির নিশ্চিত অস্তিত্ব থাকতে হবে... ফলস্বরূপ, তাদের অস্তিতের চিহ্ন ফসিলের অবশিষ্টাংশে থাকবে।[11]

ডারউইনের স্বপ্ন চূর্ণ

যদিও বিবর্তনবাদীগণ মধ্যবর্তী বা ক্রান্তিকালের ফসিল অবিষ্কারের জন্য ১৯ শতক থেকে শ্রমসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন তবুও এ পর্যন্ত কোন মধ্যবর্তী কাঠামোর ফসিল বের করতে পারেননি। খনন দ্বারা উদ্ধারকৃত ফসিল বরং বিবর্তনবাদীদের চিন্তার বিপরীত চিত্র আঁকে অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবন হঠাৎ করে ও পূর্নাঙ্গ কাঠামোয় আবির্ভূত হয়েছে মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে।

বিখ্যাত বৃটিশ জীবাশ্ম বিজ্ঞানী ডেরেক ভি এগার এক জন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করেন:

আমরা যদি শৃঙ্খলা বা প্রজাতির পর্যায় সম্পর্কে ফসিল রেকর্ড পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা বারংবার লক্ষ্য করি - ক্রমবিবর্তন নয় বরং আকস্মিক বিস্ফোরণে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি উৎপন্ন হয়েছে।[12]

এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে ফসিল রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে সকল প্রাণী হঠাৎ পূর্ণাঙ্গ কাঠামোয় আবির্ভূত হয়েছে; এর মাঝে কোন মধ্যবর্তী কাঠামো পরিগ্রহ করেনি। এ উদ্ধারকৃত বিষয়টি ডারউইনের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। জীব বা প্রাণী যে সৃষ্টি করা হয়েছে এ তথ্যটি তার অনুকূলে একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য । সকল প্রাণী হঠাৎ করে এবং ত্রুটিহীন কাঠামোয় অবির্ভূত হওয়ার

একমাত্র ব্যাখ্যা হলো এ প্রাণীরা বিবর্তনের মাধ্যমে কোন পূর্বপরুষের থেকে আগত নয় বরং এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। বির্তনবাদী জীববিজ্ঞানী ডগলাস ফতুয়িমা কর্তৃক উল্লিখিত সত্য স্বীকৃত হয়েছে:

সৃষ্টি ও বিবর্তন উভয়ের মধ্যে জীবনের উৎস সম্পর্কিত সম্ভাব্য ব্যাখ্যা মিলিয়ে যায়। জীবনের গঠন শৈলী পৃথিবীতে পূর্নাঙ্গ রূপে একবারে আবির্ভূত হয়েছিল নাকি পর্যায়ক্রমে? যদি একবারে না হয়ে থাকে তা হলে তা পূর্ববর্তী কোন প্রজাতি থেকে সংশোধনের মাধ্যমে এসেছে। আর যদি পূর্ণাঙ্গ রূপে একবারে এসে থাকে তাহলে তা কোন অসীম ক্ষমতাধর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্নের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।[13]

ফসিল দিকনির্দেশ করে যে প্রাণী পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে পৃথিবীতে একবারে এসেছে। অর্থাৎ জীবনের উৎস বিবর্তনের মধ্যে নয় বরং ডারউইনের চিন্ত ার বিপরীতে সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে।

মানব বিবর্তনের গল্প

বিবর্তনবাদের সমর্থকদের দ্বারা যে বিষয়টি প্রায়ই উত্থাপিত হয় তা হলো মানব উৎস সম্পর্কিত বিষয়। ডারউইনবাদীদের দাবি মতে বর্তমান আধুনিক মানুষ লেজহীন বানর থেকে বিবর্তন পদ্ধতিতে আবির্ভূত হয়েছে। ৪-৫ মিলিয়ন বছর আগে শুরু হওয়া কথিত বিবর্তন পদ্ধতিতে কিছু 'ক্রান্তি কালীন কাঠামো' অতিক্রম করে পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এ কাল্পনিক চিত্রে মূল চার শ্রেণীর তালিকা রয়েছে:

১. অস্ট্রালোপিটেকাস
২. হোমো হেবিলিস
৩. হোমো এরেক্টাস
৪. হোমো সেপিয়েন্স

বিবর্তনবাদীরা মানুষের তথাকথিত ১ম শ্রেনীর পূর্বপুরুষ বা 'অস্ট্রালোপিটেকাস' বলতে 'দক্ষিণ আফ্রিকার লেজহীন বানর'কে বুঝান। তবে এ প্রজাতির লেজহীন বানর বিলুপ্ত হওয়া প্রাচীণ লেজহীন বানর বই আর কিছু নয়। অস্ট্রালোপিটেকাস এর বিভিন্ন নমুনার উপর ব্যাপক অনসন্ধানে দু'জন বিশ্বখ্যাত বৃটিশ ও আমেরিকান এ্যনাটমিস্ট লর্ড

সলিজাকারম্যান ও অধ্যাপক চার্লচ অক্সনার্ড দেখান যে এরা এক সাধারণ বানর জাতির অন্তর্ভূক্ত যারা বিলুপ্ত হয়েছে এবং এদের সাথে মানুষের কোন সামঞ্জস্যও নেই।[14]

বিবর্তনবাদীরা পরবর্তী শ্রেণিকে 'হোমো' বা 'মানুষ' বলে। বিবর্তনবাদি দাবি অনুসারে হোমো শ্রেণির প্রাণি অস্ট্রালোপিটেকাস শ্রেণি থেকে উন্নততর। এ শ্রেণির বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল একটি বিশেষ কায়দায় সাজিয়ে বিবর্তনবাদিরা একটি কাল্পনিক বিবর্তন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এ পদ্ধতিটা কাল্পনিক এ কারণে যে এ'দু শ্রেণির প্রাণির মধ্যে বিবর্তন বাদের দাবিকৃত সম্পর্ক আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। বিংশ শতকের একজন শীর্ষস্থানীয় বিবর্তনবাদের রক্ষাকর্তা আর্নস মেয়ার এ বলে সত্য স্বীকার করেন যে 'প্রকৃত পক্ষে হোমো শ্রেণী পর্যন্ত শৃঙ্খল হারিয়ে গেছে।' [15]

বিবর্তনবাদে অস্ট্রালোপিটেকাস >হোমো হেবিলিস >হোমো এরেক্টাস >হোমো সেপিয়েন্স শ্রেণির আবির্ভব সংক্রান্ত দাবি অনুযায়ী পথম শ্রেণিটি পরবর্তী শ্রেণিটির অব্যবহিত পূর্ব পুরুষ। কিন্তু সাম্প্রতিক আবিষ্কার মতে অস্ট্রালোপিটেকাস, হোমো হেবিলিস ও হোমো এরেক্টাস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বসবাস করতো।[16]

অধিকন্তু, হোমো এরেক্টাস শ্রেণিটি প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হোমো সেপিয়েন্স নীন্দারথেলেনসিস্ ও হোমো সেপিয়েন্স সেপিন্স (আধুকি মানব) একই এলাকায় একই সাথে বসবাস করতো।[17]

সুতরাং এ পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে বিবর্তনবাদে দাবিকৃত মতে এ শ্রেণি গুলো কেউ কারো পূর্ব পুরুষ ছিলনা। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদি জীবাশ্ম বিজ্ঞানী স্টেফেন জে গুড বিবর্তনবাদের এ অচলবস্থা সম্পর্কে বলেন:

তিন টি হোমোশ্রেণি যদি সহঅবস্থান করে তাহলে অমাদের সিঁড়ির ভাগ্যে কি হবে? এ রকম হলে তো এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণি অবির্ভূত হতে

পারেনা! অধিকন্তু, পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকালে বির্তনের কোন লক্ষণ প্রদর্শিত হয়না।[18]

সংক্ষেপে বলতে হয়, আধা-বানর,আধা-মানবের যে ছবি এঁকে এঁকে দেখানো হয় তা মানব বিবর্তনের কাল্পনিক ছবির প্রচারণা। এ কেচ্ছার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

এক জন বিখ্যাত ও সম্মানিত বৃটিশ বিজ্ঞানী লর্ড সলি জুকারম্যান এ বিষয়ের উপর অনেক বছর ধরে বিশেষ করে পনর বছর কাল ফসিলের উপর গবেষণা করে, অধিকন্তু, নিজে এক জন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আসলে বানর পর্যায় থেকে মানব পর্যায়ে পৌছানোর কোন সিঁড়ি নেই।

জুকারম্যান অবশ্য একটি চমকপ্রদ 'বিজ্ঞান বর্ণালী' তৈরী করেন। তার এ বিজ্ঞান বর্ণালী বৈজ্ঞানিক থেকে অবৈজ্ঞনিক চিন্তায় পর্যবসিত হয়। তার বৈজ্ঞানিক বর্ণালীর প্রথম নির্ভরতা হল সঠিক তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। এর পর জীববিজ্ঞান আর তারপরে সামাজিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বর্ণলীর শেষ প্রান্তে বা বাইরে যা তা হল 'অবৈজ্ঞানিক'- যাকে বলা হয় বোধ অগম্য উপলব্ধি, যেমন- টেলেপ্যাথি, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং সব শেষে 'মানব বিবর্তন' এর অবস্থান। জুকারম্যান তার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন:
সত্যের পুর্নাঙ্গ হিসাব বাদ দিয়ে অনুমিত জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যেমন মানব ফসিল ইতিহাস বিষয়ে, অগ্রসর হলে, অশোধিত ধারণা বা ব্যাখ্যা করা যায়, দেখা যাবে (বিবর্তনে) বিশ্বাসীর ধারণায় যে কোন কিছু সম্ভব; আর (বিবর্তনে) উদ্দীপনাময় বিশ্বাসী একই সাথে পরস্পর বিরোধী বিষয়কেও কখনো কখনো বিশ্বাস করতে পারেন।[19]

আসলে, কিছু লোক কর্তৃক উদ্ধারকৃত কিছু ফসিল সম্পর্কে মতলবি ব্যাখ্যাই মানব বিবর্তনের কেচ্ছা যে কেচ্ছায় তারা এখনও আটকে আছে।

চোখ ও কানের প্রযুক্তি

চোখ ও কানের উন্নত মানের বুঝ সম্পর্কিত আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের জবাব বিবর্তনবাদ কর্তৃক অব্যাখ্যায়িত আছে।

চোখ বিষয়ে যাওয়ার আগে 'কি ভাবে আমরা দেখি' সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করি। কোন জিনিস থেকে আলোক রশ্মি এসে উল্টা ভাবে চোখের রেটিনায় পড়ে। এখান থেকে উক্ত আলোক রশ্মি কোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত হয়ে ব্রেনের পিছন দিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র স্থানে বা ভিশন কেন্দ্রে পৌছে। অতপর এ বৈদ্যুতিক সংকেত অনেক প্রক্রিয়া পার হয়ে ব্রেনের নিকট প্রতিচ্ছবি রূপে অনুভূত হয়। প্রযুক্তিগত এ পটভূমি বিবেচনায় রেখে আমরা চিন্তা করি।

ব্রেন আলো থেকে পৃথক। অর্থাৎ ব্রেনের ভিতর নিকশ অন্ধকার এবং ব্রেন যেখানে অবস্থিত সেখানে আলো পৌছেনা। ব্রেনের 'ভিশন কেন্দ্র' নামে অভিহিত স্থান টি গাঢ় অন্ধকার যেখানে কখনো আলো পৌছেনা; এমনও হতে পারে যে আপনার জানা অন্ধকারতম জায়গাগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে অন্ধকারতম। যাহোক, এ পিচের মতো আঁধারের মধ্যে আপনি এক উজ্জ্বল বিশ্বের দেখা পাবেন।

চোখের মধ্যে যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয় তা এত স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র যে ২০শ শতকের প্রযুক্তিও সেরকমটা পরিস্ফুটনের মতো সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। উদাহরণ সরূপ, যে বই খানা ধরে আপনি পড়ছেন তার দিকে তাকান, এবার মাথা তুলুন এবং চারদিকে তাকান। বই খানির মতো কোন স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবি আর কোথাও দেখতে পাচ্ছেন? এমন কি বিশ্বের সর্ববৃহৎ টেলিভিশন প্রস্তুতকারকের সৃষ্ট সর্বাধুনিক টেলিভিশনপর্দাও এরকম স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবি উপহার দিতে পারবে না। এটি তিন আকৃতির (থ্রি ডাইমেন্শনাল), রঙিণ ও চরম স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। শত বছরেরও বেশী কাল ধরে হাজার হাজার প্রকৌশলী এ প্রতিচ্ছবি তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। বৃহৎ আঙিনাবিশিষ্ট ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হয়েছে, অনেক গবেষণা হয়েছে, এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও নক্সা করা হয়েছে। আবার, একবার টিভি পর্দা ও হাতে ধরা বইখানার দিকে তাকান। স্পষ্টতা ও স্বাতন্ত্রত্যের মধ্যে আপনি ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করতে সক্ষম হবেন। অধিকন্তু, টিভি পর্দা আপনাকে

দুই আকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখায়, বিপরীত ক্রমে আপনার চোখ অপনাকে তিন আকৃতির ও গভীর রূপে দৃষ্টরূপে দেখায়।

তিন আকৃতি প্রদর্শনকারী একটি টিভি বানানোর জন্য দশ সহস্র প্রকৌশলী অনেক বছর ধরে চেষ্টা করে চোখে দেখার শক্তি অর্জন করেন, সত্যি, তবে চোখে গ্লাস নাপড়ে তিন আকৃতি দেখা যায়না; তাই এটা কৃত্রিম তিন আকৃতি। পটভূমি অধিকতর অস্পষ্ট আর সম্মুখভূমি পেপার সেটিং এর মত দেখা যায়। চোখের দৃষ্টির মতো স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র দৃষ্টি তৈরী কখনো সম্ভব হয়নি। ক্যামেরা ও টেলিভিশনের দৃশ্যেও প্রতিচ্ছবির গুণ হ্রাস পায়।

বিবর্তনবাদিরা দাবি করে যে এরকম স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবির প্রযুক্তি ঘটনাক্রম সৃষ্টি হয়েছে। এখন, কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনার কক্ষের টেলিভিশনটি কোন ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ একটি প্রচ্ছিবি সৃষ্টির জন্য সব অনু ঘটনাক্রমে একত্রিত হয়েছে - আপনার কেমন মনে হবে? বলুন তো, সহস্র মানুষ একত্রিত হয়ে যা পারেনা তা অনু কিভাবে করতে পারে?

এবার বলি, ঘটানক্রমের কৌশলটি যদি চোখের তুলনায় অধিক সেকেলে কোন জিনিস তৈরী করতে নাপারে তাহলে সেটা চোখ বা প্রচ্ছিবি কোনটাই তৈরী করতে পারবেনা। একই পরিস্থিতি কানের ক্ষেত্রেও ঘটে। বহিঃকর্ণ প্রাপ্য শব্দ সংগ্রহ করে আর মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে; মধ্যকর্ণ শব্দকে তীক্ষ্ণ করে শব্দকম্পন রূপে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে; অন্তঃকর্ণ শব্দ কম্পনকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে ব্রেনে প্রেরণ করে। চোখে দেখার কার্যক্রম যেমন ব্রেনের সংশ্লিষ্ট অংশে ঘটে অনুরূপভাবে ব্রেন কেন্দ্রেও অনুরূপ শ্রুতির কার্যক্রম চূড়ান্ত হয়।

চোখে দেখার ক্ষেত্রে যেমন কানে শেনার ক্ষেত্রেও তেমন প্রক্রিয়া ঘটে। ব্রেন যেমন আলো থেকে পৃথক থাকে তেমনি শব্দ থেকেও পৃথক থাকে। কাজেই বাহির যত কোলাহলময় হোকনা কেন ব্রেনের ভিতরটা সম্পূর্ণ নীরব। তবে সূক্ষ্মতম শব্দটিও ব্রেন উপলব্ধি করতে পারে। শব্দ থেকে পৃথক আপনার ব্রেন দিয়ে আপনি অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত শোনেন আবার

জনাকীর্ণ স্থানের সকল কোলাহল শুনতে পান। যাহোক, সে মুহূর্তে কোন ক্ষুদ্র যন্ত্র দিয়ে ব্রেনের শব্দাবস্থা মাপা হলে দেখা যাবে যে সেখানে পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

প্রতিচ্ছবি উৎপাদন ঘটনার মতো মূল শব্দের অনুরূপ শব্দ তৈরী ও প্রেক্ষপেণের জন্য দশক দশক চেষ্টার ঘটনা ঘটে। চেষ্টার ফল স্বরূপ সাউন্ড রেকর্ডার, হাই ফাইডালিটি সিস্টেম এবং শব্দ উপলব্দির সিস্টেম পাই। এত সব যন্ত্রকৌশল আর হাজার হাজার প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কান দিয়ে অনুভূত হয় এমন তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা সম্পন্ন শব্দ আজও অর্জিত হয়নি। সঙ্গীত শিল্পের বৃহত্তম কম্পানী তাদের সর্বোচ্চ গুণ প্রয়োগ করে হাই-ফাই সিস্টেম তৈরী করেছে। এমনকি এ সিস্টেম দিয়ে যখন শব্দ রেকর্ড করা হয় তখনও কিছু অংশ হারিযে যায়; আবার আপনি হাই-ফাই সিস্টেম চালু করলে মিউজিক শুরুর আগে একধরনের শোঁশোঁ শব্দ শুনতে পাবেন। যাহোক, মানব শরীরের যন্ত্র দিয়ে উৎপাদিত শব্দ যান্ত্রিক শব্দের চেয়ে অত্যাধিক তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টতর। হাই-ফাই এর মতো মানব কর্ণ কোন শোঁশোঁ শব্দসহ বা পারিপার্শ্বিকতাসহ শব্দ গ্রহণ করে না; বরং বাস্তবে যেমন ঠিকঠিক তেমনটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে।

যতদূর জানা যায়, মানব সৃষ্ট কোন দৃশ্য রেকর্ডিং বা শব্দ রেকর্ডিং যন্ত্র চোখ বা কানের মতো সংবেদনাত্মক উপাত্ত গ্রহণে সাফল্য অর্জন করেনা।

তবে মনে রাখতে হবে, দেখা ও শোনার ক্ষেত্রে এ আলোচনার অধিক আরো অনেক কথা আছে।

ব্রেন এর মধ্যে দেখা ও শোনার সচেতনতা কার?

ব্রেন থেকে কে মনোমুগ্ধকর বিশ্ব দেখে, কে সঙ্গীত ও পাখির ডাক শোনে আর কে ফুলের গন্ধ নেয়?
মানব চোখ, কান ও নাক দিয়ে যে উদ্দীপনা আসে তা বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক স্নায়ুবীয় তাড়নার দ্বারা ব্রেনে ভ্রমণ করে। এ সব প্রতিচ্ছবি কেমন করে ব্রেনে সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জীব বিজ্ঞান, শরীর বিদ্যাও প্রাণ

রসায়ন গ্রন্থে বিস্তারিত জানতে পারবেন। যদিও নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আপনি কোন বক্তব্য পাবেন না: বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক স্নায়ুবীয় তাড়নার দ্বারা ব্রেনে দৃশ্যের, শব্দের, গন্ধের যে প্রতিচ্ছবি তৈরী হয় তা কে বোঝে? ব্রেনের মধ্যে এক চেতনা আছে যে চোখ, কানও নাকের সাহায্য ছাড়া বোঝে। কে এ চেতনার মালিক? কোন সন্দেহ নেই যে এ চেতনা ব্রেনের স্নায়ু, চর্বিস্তর ও নিউরনের মালিকানাভূক্ত নয়। এ কারণে যারা বিশ্বাস করে যে সব কিছু বস্তুর দ্বারা সৃষ্টি সেই বস্তুবাদী ডারউইন সম্প্রদায় এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়না।

এ চেতনার পিছনে আত্মা রয়েছে যা স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। আত্মার কোন কিছু দেখার জন্য চোখের বা কোন কিছু শোনার জন্য কানের প্রয়োজন হয়না। আরো বলতে হয় যে চিন্তা করার জন্য এর ব্রেনের প্রয়োজন হয়না।

যে কেউ এ বিশদ ও বৈজ্ঞানিক সত্য পড়ে তাকে ভাবতে হয় যে এক জন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যাঁকে ভয় পেতে হয়, যাঁর নিকট আশ্রয় নিতে হয়; যিনি ত্রিমাত্রিক, রঙিন, নিজ নিজ আকারে যাবতীয় ছায়াপথসহ সমগ্র বিশ্ব সামান্য কয়েক ঘনমিটার নিকষ কালো স্থানের মধ্যে চেপে রাখতে পারেন।

এক বস্তুবাদি বিশ্বাস

আমরা যে সব তথ্যাদি উপস্থাপন করলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিবর্তনবাদের দাবি বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। জীবনের উৎস সম্পর্কিত দাবি বিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, কারণ বিবর্তন কৌশলের বিবর্তনীয় ক্ষমতা নেই; এ ছাড়া ফসিল রেকর্ডে কোন মধ্যবর্তী বা ক্রান্তিকালীন আঁকার নেই। সতরাং, বিবর্তনবাদকে একটি অবৈজ্ঞানিক ধারণা হিসেবে ফেলে দেয়া উচিৎ; এক দিন যে ভাবে পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা ফেলে দেয়া হয়েছে।

মজার কথা, বির্তনবাদী ধারণা জোর করে আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ এ তত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনাকে 'বিজ্ঞানের প্রতি আঘাৎ' বলে অভিহিত করেন। কেন করেন?

কারণ, কোন কোন চক্রেরে নিকট বিবর্তন তত্ত্ব একটি আবশ্যকীয় বিশ্বাস বা একধরনের তাবিজ। এ সকল চক্র বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের অন্ধ ভক্ত; তাই তারা বস্তুতান্ত্রিক দর্শন ব্যাখ্যার সুবিধার্থে একমাত্র এ ভিত্তিহীন ডারউইনবাদটি আঁকড়ে ধরে আছে; আর একে প্রকৃতির কার্যক্রমের ব্যাখ্যা হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে।

আরো মজার বিষয় যে তারা প্রায় সময় এ সত্যটি অস্বীকার করে। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বহুল পরিচিত বংশানুগতি বিজ্ঞানী ও স্পষ্টবাদী বির্তনতত্ত্ববিদ রিচার্ড সি লিয়ন্টিন স্বীকার করেন যে তিনি 'প্রথমত শীর্ষস্থানীয় বস্তুবাদী আর অতপর বিজ্ঞানী':

এ নয় যে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রণালী, যে ভাবে হোক, আমাদেরকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করাচ্ছে; বিপরীতক্রমে, আমরা পূর্ববর্তী কোন বস্তুতান্ত্রিক মতলব দ্বারা পরিচালিত হয়ে অস্পষ্ট বস্তুতান্ত্রিক ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। তবে, বস্তুতান্ত্রিকতা অবিমিশ্র; সুতরাং, আমরা স্বর্গীয় কোন কিছুকে অনুমোদন দিতে পারিনা।[20]

মূলত, যাতে বস্তুতান্ত্রিক দর্শনে লেগে থাকা যায় সে উদ্দেশ্যে অসত্য প্রমাণিত ডারউইনবাদ আঁকড়ে রাখা হয়েছে। ডারউইনতত্ত্ব বলে যে বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নেই। সতরাং, অজৈব ও অচেতন বস্তু জীবন সৃষ্টি করেছে। এ তত্ত্ব জোর দিয়ে বলে যে মিলিয়ন মিলিয়ন ধরনের ও সংখ্যার প্রাণীকূল যেমন, পাখি, মাছ, জিরাফ, বাঘ, পতঙ্গ, বৃক্ষ, ফুল, হাঙ্গর, এবং মানুষ বিভিন্ন পদার্থ যেমন, বৃষ্টি, বজ্র ইত্যাদির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ ধারণাটি মূলত যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিপরীত। তবুও,' দোর গোড়ায় স্বর্গীয় পদক্ষেপ' ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ডারউইনবাদ রক্ষার প্রচেষ্টা চলে আসছে।

অথচ,বস্তুতান্ত্রিক মতলব ছাড়া কেউ যদি সাদা চোখে জীবন্ত প্রাণীর দিকে নযর করে তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এ সত্য দেখতে পাবে: সকল জীব সর্বক্ষমতাধর, সর্ববিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনি আল্লাহ্, যিনি অস্তিত্বান কোন কিছু ছাড়াই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সর্বোত্তম আঁকারে নক্সা করেছেন আর সকল প্রাণীকে বর্ণিল করেছেন।

NOTES

1. Hugh Ross, *The Fingerprint of God*.p.50	12. Derek A. Ager, 'The Nature of the Fossil Record', *Proceedings of the British Geological Association*. Vol. 87,1976,p. 133
2. Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evaluation and The Origin of Life*, New York: Marcel Dekker,1977,p.2	13. Douglas J. Futuyma, *Science on Trial*, New York: Pantheon Books,1983,p .197
3. Alexander I. Oparin, *Origin of life*.(1936) New York, Dover Publications,1953(Reprint),p.196	14. Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, New York: Toplinger Publications,1970,ss75-94; Charles E Oxnard, 'The Place of Australopithecines in Human Evaluation: Grounds for Doubt', *Nature*. Vol. 258, p.389
4. 'New Evidence on Evaluation of Early Atmosphere and Life', *Bulletin of American Meteorological Society*. Vol. 63 November1982,p.1328-1330.	15. J. Rennie,' Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayer', *Scientific American*. December 1992
5. Stanley Miller, *Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules*.1986,p.7	16. Alan Walker, *Science*. Vol. 207,1980, p. 1103;A.J. Kelso, Physical Anthropology 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, p. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, Vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p.272
6. Jeffrey Bada, *Earth*. Februry1998,p. 40	17. *Time*. November1996
7. Leslie E. Orgel, The Origin of Life on Earth', *Scientific American*. Vol. 271,October1994, p. 78	18. S. J. Gould, *Natural History*. Vol. 85,1976, p. 30
8. Charles Darwin, The Origin of Species: *A Facsimile of the First Edition*. Harvard University Press,1964, p.189	19. Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*. New York: Toplinger Publications,1970, p.19
9. Charles Darwin, The Origin of Species: *A Facsimile of the First Edition*. Harvard University Press,1964, p.184	20. Richard Lewontin, 'The Demon-Haunted World' *The New York Review of Books*.9 January,1997, p. 28
10. B. G. Ranganathan, *Origins?*. Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust,1983	শব্দ-সংকেত
11. Charles Darwin, The *Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*. Harvard University Press,1964, p.179	ছ- ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম র- রাদিয়াল্লাহু আনহু(মা) আ: আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আরবী অক্ষর, উচ্চারণ, বাংলা প্রতিঅক্ষর ঃ

ج	ث	ت	ب	ا
জীম	ছ্যা	তা	বা	আলিফ্
জ	ছ	ত	ব	অ/আ
ر	ذ	د	خ	ح
র-	যাল্	দাল্	খ-	হ:া
র	য	দ	খ	হ:
ض	ص	ش	س	ز
দ্ব-দ্	ছ-দ্	শীন্	সীন্	জ:া
দ্ব	ছ	শ	স	জ:
ف	غ	ع	ظ	ط
ফা	গঈ:ন্	আঈ:ন্	জ্ব-	ত্ব-
ফ	গ	য়:	জ্ব	তঃ্ব
ن	م	ل	ك	ق
নূন্	মীম্	লাম্	কাফ	ক্ব-ফ্
ন	ম	ল	ক	ক্ব
	ى	ے	ه	و
	ই:য়া	হামজ:হ্	হা	ওয়াও
	ই:/ঈ:	অ/আ	হ	ও

সূত্র ঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরআন শারীফ শিক্ষা
প্রথম ভাগ, [৭ম সংস্করণ]
ক্ব-রী মাওলানা মুহ:াঃ রমজান আলী।
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলো। - অনুবাদক।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বানান ও উচ্চারণ

ا হামজ:াহ্	যবর	ا আ	আকবর
ع আঈন	যবর	عَ য়:া	য়ায়িশাহ্
خ খ-	যবর	خَ খ-	খ-লিক
قَ ক্ব-ফ	যবর	قَ ক্ব-	ক্ব-লীম
ك কাফ	যবর	كَ কা	কামিল

শব্দ ও উচ্চারণ

رَهِمَ	র-হিমা	مَدِيْنَ	মদীনা	سِرِىَ	সিরিয়া
قَبْلِهِمْ	ক্বলিহিম	رَبِّكُمْ	রব্বিকুম	عِزَّةٌ	য়িঃজ্জ:াহ্
هُزُوًا	হুজু:ওয়াা	سُوْرَ	সূর-	رَكَّةٌ	র-কাত